শিকার কাহিনী

আমার বিশ্বাস সঙ্গীতের মত শিকারেও গুরু ও ঘরানার দরকার। কিন্তু শিকারজীবনে আমি সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। বাল্যকালে স্বর্গীয় পিতৃদেব ও পিতৃব্যের কাছে আমার অস্ত্র শিক্ষায় হাতেখড়ি; এবং তাঁরা শিকার শেখাবার আগে বন্দুক ব্যবহারকালে নিরাপত্তা ও শিকারের closed season মেনে চলার ওপর বড় বড় উপদেশ দিয়েছেন। তখন ঐ সব বক্তৃতা শুনতে মন চাইত না, ভাবতাম শিখব তো পশুপাখি মারা, বন্দুক নিয়ে কি করে শিকার করতে হয়, এসব শিখে কি হবে। কিন্তু সেই শিক্ষার মর্ম এখন প্রতি পদে উপলব্ধি করি। ভাবি, তাঁরা কি মূল্যবান বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই না আমার অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন।

কোনো শিক্ষারই শেষ নেই। আমিও শিকার বিষয়ে এখনও শিক্ষানবিশ। তাই শিকারী বন্ধুবান্ধব ও অভিজ্ঞ কাউকে পেলেই ধরে বসি কিছু জ্ঞান লাভের জন্য। পরবর্তীকালে আমি যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি, সেটা এই ভাবেই, এবং এজন্য আমি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই গল্পগুলো আমার সামান্য শিকারজীবনেরই ঘটনা, একটু সাজিয়ে তুলে ধরা। তবে কথোপকথনগুলো যতটা সম্ভব মনে করে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি। তাই কাগজ কলমে এই বইটির রচয়িতা আমি হলেও এর প্রকৃত মালমশলা জুগিয়েছেন শিকার সঙ্গীরাই,—তাঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

নিউ আলিপুর
আশ্বিন ১৩৬৭

জগমোহন মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র ।

যে সব পশুপাখি
আমার হাতে
প্রাণ হারিয়েছে, তাদের
স্মরণে

সে বছর হাজারিবাগের একটা ব্লক নিয়ে নিলাম শিকারের জন্যে। ব্লকটার নাম-ডাক শুনেছি আগে; পৌঁছে জানলাম শিকার বেশির ভাগই হরিণ, সম্বর; বাঘ এক রকম নেই বললেই হয়। শুধু আমাদের

....

চিতা শিকার
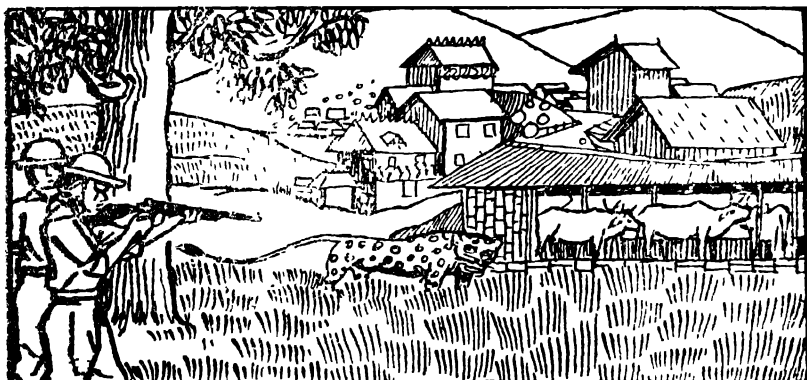
শিকার কাহিনী

....

বাংলোটা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে হওয়ায় রসদ সংক্রান্ত অনেক অসুবিধা থেকে বাঁচা গেল।

সেখানে পৌঁছনোর পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সেরে মৌজ করে রোদ পোহাচ্ছি, হাত-পা ছাড়াচ্ছি, এমন সময় একটি যুবক এল, নাম রফি। আলাপের পর তাকে খুব ভাল লাগল। যদিও সে পেশাদার গাইড নয়। তবু এই ভদ্র রফিকে, শিকারে উপযুক্ত সহকারী হবে বলে ধারণা হওয়ায় ভাবতে ভাল লাগল। মনে হল বেশ শিক্ষিত, বয়স চব্বিশ পঁচিশ। আলাপে অন্তরঙ্গ হতে সময় নিল না। তার শিকারের বাতিক সাঙ্ঘাতিক, শুধু সুযোগ আর সঙ্গীর অভাবে বেচারীর শখ মেটে না। আমাদের সঙ্গী পেয়ে খুশিই হল সে। রফি থেকে রফিসাহেব হয়ে সে আমাদের দলে ভিড়ল।

এরপর চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও দিনে-রাতে ডাকা মাত্র রফিসাহেব হাজির। স্পটারের কাজে রাতারাতি তার দক্ষতার পরিচয় পেলাম। তবু নিজের সমস্ত গুণ গোপন করে সে আমাকে একজন পাকা শিকারী বলে ধরে নিয়েছিল—শিকারে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকত—কেমন যেন আমার পর তার একটা আস্থা জন্মে গিয়েছিল এই স্বল্প পরিচয়েই। একদিন রফিসাহেব স্থানীয় একজন লোককে সঙ্গে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'মাইল চারেক দূরে এর ক্ষেত ; সেখানে ক্ষেতে হরিণ এসে ফসল খেয়ে তছনচ করে ; আপনারা যদি যান তো এক ঢিলে দু'পাখি মরে—শিকারও হয়, বেচারীর ফসলও রক্ষা পায়।'

যাওয়া স্থির হল। সবে দশটা বাজে। রোদের মৌতাতের আরাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুনি। জায়গাটা ঘুরে সব ব্যবস্থা করে আসতে।

গন্তব্যস্থলে পৌছে দেখলাম বিরাট ক্ষেত। লম্বা চওড়ায় এক বর্গ মাইল প্রায়। তার তিনদিকে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা, একদিকে শুধু রাস্তা। দু'পাশের জঙ্গল কিছু পাতলা ; অন্য ধারে ক্ষেতের শেষেই ছোট পাহাড়ী

নালা আর তারপর থেকেই পাহাড় ও ঘন জঙ্গলে জমিটা দু'দিক থেকে ঢালু হয়ে এসে ক্রমশ মাঝখানটায় একটা খাদের মতো সৃষ্টি হয়েছে—দূরের পাহাড় থেকে জমিটাকে দেখলে মনে হবে কেউ বুঝি বিরাট মোটা একটা বই মাঝখান থেকে খুলে রেখে দিয়েছে। সেই খাদের একপাশে অড়হড়ের ক্ষেত, অন্য দিকে কিছুটা সুরগুজা ক্ষেত, বাকীটা অনাবাদী পড়ে আছে।

প্রথমেই নালা পেরিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকটা দেখা গেল। পাহাড়ে নালার পাশে পাশে নরম মাটিতে জানোয়ারদের স্পষ্ট পায়ের ছাপ। সেই ছাপ দেখে বুঝলাম চেতরা, সম্বর বাদেও ফোটরা, আর শুয়োরেরাও এখানে আসে। কিন্তু তারপরই একটি চরণচিহ্ন দেখে বিস্মিত হয়ে উঠলাম—এ দাগ যে বিশিষ্ট জনের, তা হলে কি তার সঙ্গে মোলাকাৎ হবে এখানে!

ক্ষেতের মালিককে প্রশ্ন করলাম, 'এ-দিকে চিতার যাতায়াত আছে কি?'

উত্তরে সে বলল, 'কিছুদিন আগে বিকেলে হঠাৎ এক চিতা একটা গরুর ওপর হামলা করে। কিন্তু লোকজন জানতে পেরে হল্লা করে তাকে ভাগিয়ে দেয়। তারপর আর কোনো খোঁজ নেই।'

তবু আমার মুহূর্তের জন্য মনে হল, সে যেন নিখোঁজ হয় নি। গা ঢাকা দিয়ে আড়ালে সুযোগ খুঁজছে মাত্র। পরে অবশ্য কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

ক্ষেতের দু' প্রান্তে মাচার মতো উঁচু করে কুড়হা বাঁধা। স্থির করলাম এর ওপর চড়েই রাত্রে শিকার করা যাবে। সমস্ত ঠিক করে দুপুরে বাংলোয় ফিরলাম।

সন্ধ্যের অনেক আগেই আমরা ফের রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছে ক্ষেতের মালিকের আস্থানায় ঘন দুধ দিয়ে আরাম করে কফি খেয়ে শরীর চাঙা করে মাচায় এলাম। রফি আমার সঙ্গে রইল। কৃষ্ণপক্ষের শেষের এক তিথি। চারদিকে জমাট অন্ধকার। পাশের প্রান্তর ও দূরের জঙ্গলে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। সমস্ত মিলিয়ে একটা ছমছমে ভাব। তার মধ্যে নিষ্পলক চোখে বসে আছি শিকারের আশায়। খুট করে শব্দ হলেই ভাবছি বুঝি শিকার এসেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যতদূর চোখ যায় দেখতে চেষ্টা করি। এ ভাবে অপেক্ষা করে করে সময় কাটছে। রাত ন'টা। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে কোনো শিকারই জুটল না। দশটা। তবু কোনো জানোয়ারের পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত রফি বলল, 'নেমে পড়ুন—বসে থেকে কি হবে, তার চেয়ে বস্তীর লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখি আজ আর জানোয়ার আসার সম্ভাবনা আছে কিনা।'

কথাটা আমার ভালই লাগল। কুড়হা থেকে নেমে দোমড়ানো শরীরটাকে সোজা করে আরাম বোধ হল। রফি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল ; বলল, 'এই শীতে আমার কথায় কষ্ট পেলেন—অথচ বরাতে কিছুই জুটল না।'

আমি হেসে বললাম, 'তাতে কি হয়েছে ; যা দিনকাল, শহরের লোকেরা কথা দিয়ে আসে না—আর এত হল জঙ্গলের জানোয়ার।' রফি তবু সান্ত্বনা পেল না বলল, 'সত্যি আজকের ব্যাপারটা আশ্চর্য, এমন কোনো রাত যায় নি—যেদিন এই ক্ষেতে জানোয়ার আসে নি। কিছু বুঝতেই পারছি না মাথামুণ্ডু।'

রফির কথাটার ঠিক অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হল না। ও কি ভাবছে আন্দাজ করতে পারলাম না।

শেষে রফি বলল, 'চলুন বস্তীতে গিয়ে খোঁজ নিই—গভীর রাতে আশা আছে কিনা।'

সামনে রফি, পেছন পেছন আমি। মাঝের খাদ মতো জায়গাটা দিয়ে বস্তীর পথ। অন্ধকারেই পথ হাঁটছিলাম। রফি দরকারে ছাড়া আলো জ্বালছিল না। জমাট অন্ধকারে দু'জনের পা চলছে। সাবধানতা সত্ত্বেও খাদটা পার হবার সময় আমি হঠাৎ ধপাস করে কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়ে গেলাম। খুব সাবধানে হাঁটার জন্য তেমন চোট না লাগলেও হাতের রাইফেল বাঁচাতে শরীরের বাঁ দিকের ওপর দিয়ে সমস্ত ধাক্কাটা সামলাতে বাঁ-হাঁটু আর বাঁ কাঁধে ব্যথা লাগল। হাত ছড়ে গেল কাঁটা গাছে। আবার উঠে হাঁটতে শুরু করলাম। শব্দ করা বা আলো জ্বালা নিষিদ্ধ, অতএব বস্তীতে পৌঁছেই যা হয় ফার্স্ট এড নেব ঠিক করলাম।

কিছুক্ষণেই বস্তীর পেছন দিকটায় পৌঁছে গেলাম। খাদের এ-পাশে সুরগুজা ক্ষেতের পর শূন্য প্রান্তর—মাঝে-মাঝে ছোট ছোট বুনো ঝোপ। কৃষ্ণপক্ষের রাত হলেও ফাঁকা মাঠের কাছে কিছু আবছা আলোর আভাস পাওয়া গেল। Starlight বা নক্ষত্রের আলোয় ঝোপঝাড় বাদে বাকী মাঠটায় অন্ধকারটা অনেক ফিকে। মাঠ ভেঙে যাচ্ছি। পাহাড় আর গভীর জঙ্গলের দিকে মুখ করে বস্তীটা ক্ষেতের শেষ প্রান্তে রয়েছে। আর পেছন দিকটায় গোশালা। সব মিলিয়ে বস্তীটির অবস্থান Tর মতো অনেকটা।

বস্তীর দিকটার যেতে ডান পাশে গোশালা। বস্তী আর আমাদের মাঝামাঝি সল্প ঢালু একটুকরো মাঠ। সামনে এগোতে এগোতে অস্পষ্ট আলোয় হঠাৎ মনে হল গোশালার পাশে সেই মাঠে কি

যেন একটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রথমে গরু বা মোষের বাছুর বলে মনে হল। রফি স্পট লাইটের আলো ফেলতেই পলকে সেই আলোয় আগুনের ভাঁটার মতো দু'টো চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠেই মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই রফির বিস্ময়-মেশানো ফিসফিস শব্দ কানে ঢুকল, 'হুঁশিয়ার, চিতা!'

চোখ দেখেই চিতা মালুম পেয়েছি—কিন্তু এখন হুঁশিয়ার আর হব কি করে। মুখোমুখি মাটির পর খানিকটা বিপদজনক বোধ হল। মাত্র কুড়ি-বাইশ গজ দূরেই চিতার আবির্ভাব। তবু যা সুবিধে, ঢালু মাঠটুকুর উঁচু দিকে আমরা রয়েছি। তেমন ঢালু না হলেও চিতা আমাদের চেয়ে কিছুটা নিচে।

ইনিই এর আগে একদিন গরু ধরতে এসে হল্লার ভয়ে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন বেশ বুঝলাম। রাত্রির অন্ধকারে যাতে কোনো ঝামেলা না হয় তাই তো চোরের মতো কাজ হাশিল করতে এসেছেন। কিন্তু এখন কি করা যায়—আমাদের গন্ধ পেয়ে লজ্জায় সেই যে মুখ ফেরালেন—আর এদিকে আসবার নামটি নেই। শুধু তার অস্পষ্ট শরীরটা দেখতে পাচ্ছি। রাইফেল তুলে আন্দাজে নিশানা করতেই রফি বাঁ-হাত দিয়ে নলটা নামিয়ে বাধা দিল। বলল, 'পেছনের গরু মোষের খাটাল, গুলি ফসকালেই বিপদ।'

গোয়ালের কথাটা আমার মনেই ছিল না; উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছিলাম তাই রফিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। ভাবলাম, তার শটগানে এল. জি গুলি দিয়ে কায়দা করতে পারবে। রফিকে বলতেই সে উত্তর দিল, 'না: দেখি কি হয়।'

রফি হাতের জ্বালানো আলোটা এবার নিবিয়ে একটু বাদেই আবার জ্বালল। চিতার একটা চোখ তার মধ্যেই এদিকে ফিরেছে।

বিপদটা সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। আলোয় বার দুই তাকিয়ে আবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। দু'-এক পা বুঝি সামনে এগোল, তবু দু'টো চোখ নজরে পড়ল না। রফি হঠাৎ বোধ হয় বিপদের আভাস পেয়ে কনুই দিয়ে আমায় গুঁতো মেরে আলোটা নিবিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথায় লাগানো জোরালো হেড লাইটটা জ্বাললাম। এই সামান্য পলকের ভগ্নাংশে দেখলাম চিতা খানিকটা এগিয়ে একটা ঝাড়ির (ঝোপের) আড়ালের মধ্যে মাটিতে বুক মিশিয়ে বসে পড়েছে।

দু'টো চোখই এবার স্পষ্ট জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এখন আরো মুশকিল। চিতার পেছনেই এবার বস্তীর মাটির দেওয়ালগুলি, ফসকালে মানুষ খুনের দায়ে পড়তে হবে।

বাঘ বা চিতারা ঘেরের মধ্যে পড়লে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ঠিক ঘের না হলেও ওর পেছনের রাস্তা বন্ধ, পালাবার একমাত্র পথ আমাদের সামনে দিয়ে—সুতরাং এই প্রায় বন্দী অসহায় চিতা যে কোনো সাঙ্ঘাতিক অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। পাশে বেশ বড় দু'টো আমগাছ নজরে পড়ল। একটা চিতার কাছাকাছি অন্যটা আমাদের। মাথায় বুদ্ধি এল হঠাৎ, রফিকে ঠেলতে ঠেলতে আম-গাছটাব কাছে চলে এলাম—এখান থেকে দু'টো সুবিধে: প্রথমত গাছের পেছনে আমাদের অবস্থানটা খানিকটা সুবিধাজনক। দ্বিতীয় সেখান থেকে চিতাকে লক্ষ্য করলে গুলি ফসকালেও গোশালা বা বস্তীতে যাওয়ার ভাবনা নেই।

গাছের কাছে পৌছনোর আগেই আমি আলো নিবিয়ে আবার জ্বালতেই দেখি চিতা ঝোপের পেছন থেকে বেরিয়ে তার কাছের আমগাছটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল ওই দিক দিয়েই

ওর যাবার ইচ্ছে—আর সে এসেছেও বোধ হয় ওই পথ ধরে। সুতরাং পথ আটকালে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

মিনিট দুই-তিন লুকোচুরি খেলা চলল। সে বিরক্ত হয়ে উঠে সামান্য গোঁ গোঁ করল, খানিকটা গোঙানির মতো। ব্যাপারটা এবার খুবই মুশকিলের—চিতার ডাক শুনে বস্তীর লোকেরা এসে হল্লা করলেই সর্বনাশ। কিন্তু অনুমান মতো কিছু ঘটল না। ক'টা কুকুর কেবল চড়া পর্দায় কেঁউ কেঁউ করেই থেমে গেল। আমরা দু'জনেই সম্মোহিতের মতো হঠাৎ সব ভুলে দাঁড়িয়ে আছি। আর একটু অন্তত ইঞ্চি ছয়েক এগিয়ে দাঁড়ালে ওর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও গাছের মোটা গুঁড়িতে তা আটকে যেত—তা না হলে এখান থেকে গুলি করা সম্ভব নয়। আগের জায়গায় যেতে পারলে এখন অবশ্য সুবিধে হয়। সেই ভেবে চিতার গায়ে আলো ফেলে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম।

আমার মাথায় হেডলাইটাই জ্বলছে। গতিক ভাল নয় বুঝে রফি আগে-ভাগেই টর্চটা কোমরে ঝুলিয়ে দু'হাতে বন্দুক নিয়ে রেডি হয়ে গেল।

সুবিধে মতো জায়গায় এসে রাইফেল তুলে টিপ করতে গিয়ে দেখি সামনের মাছির ওপর লাগানো সাদা অ্যাঢেসিভ টেপ নেই—যখন পড়ে গিয়েছিলাম তখনই হয়তো সেটা খুলে গেছে। অথচ অন্ধকারে মাছি দেখতে না পেলে টিপ করাও শক্ত। তাছাড়াও পড়ে গিয়ে কিছুটা ব্যথা পেয়ে আমার মনের নির্ভরতাও অনেকটা কমে গিয়েছে—তবু রফিকে রেডি বলে যা থাকে কপালে ভেবে ট্রিগার টিপলাম। বাঁ চোখ খুলে কিছু বুঝবার আগেই রফির বন্দুকও গর্জে উঠল। পর পর দু' দু'টো বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ সামনের

পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে গুম্ গুম্ করে বহুদূরে গড়িয়ে যেতে লাগল। বস্তীবাসীরা সেই আওয়াজ পেয়েই যে যার ঘণ্টা বাজানো শুরু করল। এটা রেওয়াজ। লোকেরা শব্দ করে শিকারীকে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দেয়, যাতে সেদিকে না কেউ গুলি ছোঁড়ে।

রাইফেল নামিয়ে দেখলাম দ্বিতীয় আমগাছের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে রফি তাকিয়ে আছে। রফির দৃষ্টি অনুযায়ী চোখ ফেলতেই দেখলাম ধরাশায়ী চিতার ল্যাজটা তখনো ওঠানামা করে মাটিতে আছাড় খাচ্ছে। বুঝলাম আমরা বিপদ মুক্ত। একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। বললাম, 'যাক বাঁচা গেল।'

রফি উত্তরে বলল, 'খুবই অসুবিধেজনক জায়গায় পড়েছিলাম— আমরা কিছু করার আগে ওই হামলা করতে পারত।'

বস্তীর লোকেরা হ্যারিকেন নিয়ে এর মধ্যে এসে পড়ল। সকলেই চিতাটার কাছে গেলাম। প্রথম থেকেই আমার ধারণা আমার গুলি চিতার গায়ে লাগে নি। সামনে এসে দেখলাম অনুমান সত্য, আমার গুলিটা চিতার কাঁধ ছুঁয়ে গাছের গুঁড়িতে বিঁধেছে। আসলে রফির গুলিতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

রফিকে অভিনন্দন দিয়ে বললাম, 'আজ তোমার স্থির বুদ্ধির জন্যই আমরা ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেলাম।'

জঙ্গলের ডাকবাংলোয় রাত্রি প্রায় ন'টার সময় দরজা ধাক্কানো শুনে ঠাকুমার ঝুলির রূপকথার সেই কথাটা মনে এল, এত রাত্রে কে ডাকাডাকি করে ?

....

রামসিংহের সাহস

শিকার কাহিনী

....

কিন্তু প্রথম ধাক্কায় আমি কোনো সাড়া দিই নি। পর পর দু'রাত জেগে শিকারে গিয়ে শরীর ক্লান্ত, কাজেই তৃতীয় রাত্রি পুরো বিশ্রাম

নেব ঠিক করেছি। স্থানীয় শিকার-সঙ্গী রফি এসেছিল হাঁকোয়ার প্ল্যান করতে, আমি তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে নৈশভোজন শেষ করে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একে শীতকাল, তার ওপর দু'রাত্রি ঘুম নেই, কাজেই বিছানায় গা-টা এলিয়ে দিতে সারা শরীরে একটা আরামের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। শিয়রে রাখা হ্যারিকেনের মৃদু আলোতে রিডার্স ডাইজেস্টের একটা গল্প পড়ছি, আর নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছি। তখন কি আর কেউ ডাকলে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভগবান বিরূপ, দরজায় আর একবার ধাক্কা পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক, 'শিকারী সাহেব হো।'

বিরক্ত হলাম, কিন্তু উঠতেই হল। দরজা খুলে দেখি বারান্দায় দু'টো লোক। একজন বেশ লম্বা, আর একজন বেঁটে। তাদের হাতে হ্যারিকেন, গায়ে পুরোনো কোট, আর তার ওপর নাক আর চোখ দু'টো খোলা রেখে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত চাদর জড়ানো। আমাকে দেখে লম্বা লোকটি হ্যারিকেনটা নিজের মুখের কাছ পর্যন্ত তুলে, ঠোঁটের ওপর থেকে চাদরটা নামিয়ে বলল যে, সে ক্ষত্রিয়, নাম রাম সিং, এখানকার দোকানগুলোতে সে দুধ বিক্রী করে। লোকের মুখে আমার কথা শুনে সে এসেছে। তার পাকা ধানের ক্ষেত রোজ রাত্রে একদল শুয়োর এসে তচনচ করে দিয়ে যাচ্ছে। এখন আমি যদি দয়া করি, তবে তার ফসল বাঁচে, আর আমার শিকারও হয়।

আমার বিরক্ত ভাব কাটে নি, বললাম, 'তোমরা তাদের তাড়িয়ে দাও না কেন?'

'হুজৌর,' রামসিং বলল, 'সে শুয়োর এক-একটা মোষের বাচ্চার মতো। সেদিন রাত্রে আমরা তাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি শুয়োর আমাকেই তাড়া করল। মেরেই ফেলত আমাকে,

নেহাৎ কাছাকাছি একটা খেজুরগাছ পেলাম, তাতে উঠেই জান বাঁচিয়েছি। সে কথা মনে করলে এখনও ভয়ে কাঁপতে থাকি।'

এখন সমস্যায় পড়লাম। একদিকে অত বড় শুয়োর, অন্যদিকে আরামেব বিছানা। কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখি নিজে ঠিক না করতে পেরে, রামসিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রফিসাহেবকে চেন ?'

'খুব চিনি,' সে ঘাড় হেলিয়ে বলল।

বললাম, 'তাকে গিয়ে ধর। সে যদি যায় তবেই আমি যাব।'

রামসিং তার অনুচরকে নিয়ে প্রস্থান করল। আমিও বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম আবার। ভাবলাম, রফি এই শীতে আর যাচ্ছে না, কাজেই আজ রাত্রে ঘুম দিতেই হবে। কিন্তু পনের মিনিট কাটল না দেখি ওরা রফিকে এনে হাজির। রফি ঘরে ঢুকে মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল, 'আজও আপনার বরাতে ঘুম নেই।'

রফির কথায় ও হাসিতে আমার ঘুম আর বিরক্তি দুই-ই উবে গেল। সে তার শিকারী বেশে, কাঁধে একনলা বন্দুকটা ঝুলিয়ে প্রস্তুত।

আমি চেয়ারগুলো এগিয়ে দিয়ে রফিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি, সত্যি শুয়োর আসে তো ?'

রফিকে উত্তর দিতে হল না, রামসিংই বলল, 'হুজৌর, আপনি চলুন, দেখবেন ওরা ঠিক রাত্রি বারোটার সময় আসবে। রোজ তারা ঐ সময়েই আসে।'

একথা শুনে রফির দিকে চাইতে, রফিও বলল, 'ওদিকটায় শুয়োর খুব আছে। যদি চান, চলুন, শুয়োর পেয়ে যাবেন ঠিক।'

ব্যাপারটাকে আর উপেক্ষা করা গেল না। আমি খানসামাকে ডেকে কফি তৈরী করতে বলে নিজের পোশাক পাল্টাতে শুরু করলাম। তারপর কফি খেয়ে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ, রফি আর রামসিং-এর
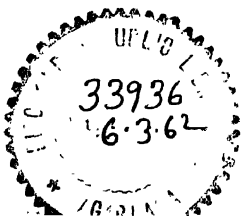
সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। রামসিং তার অনুচরকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ক্ষেতের পাশে কুড়হায় বসবার জায়গা ও আগুন ঠিক করে রাখবার জন্য।

পথ কম করার জন্য রামসিং কিছুটা রাস্তা বরাবর গিয়েই মাঠে নেমে পড়ল। ওঃ, লাঙলচষা সে যে কি মাঠ, আর তার ওপর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। যাই হোক, রফির সাহায্যে, অনেক কসরৎ করে রাত্রি প্রায় পৌনে এগারোটার সময় আমরা গন্তব্যস্থানে পৌছে গেলাম। দেখলাম বিঘে পাঁচ-ছয় করে পাশাপাশি দু'টো ধানের ক্ষেত, আর তাদের মাঝখানে ফুট-তিনেক চওড়া একটা আল। সেই আলের ওপর ছোট্ট কুড়হার মধ্যে খড় বিছিয়ে আমার বসবার জায়গা হয়েছে, আর তার সামনেই ছোট্ট একটু আগুন করা। কুড়হার মধ্যে সেই বেঁটে লোকটা বসেছিল। আমরা যেতেই সে উঠে পড়ল। রফি তাকে নিয়ে ক্ষেতের অন্য কোণে চলে গেল। রামসিং আর আমি রয়ে গেলাম এই কুড়হাতেই। সেখানে আমি প্রথমেই আগুনটা নিবিয়ে ফেললাম, আর ধোঁয়াভর্তি কাঠগুলো ধানের ক্ষেতের জলে গুঁজে দিলাম। মাঝে মাঝে হাত গরম করে নেবার জন্য ছাইচাপা দিয়ে অল্প একটু আগুন রেখে দিলাম। তারপর কুড়হার দেওয়ালে রাইফেলটা ঠেসান দিয়ে রেখে, যতটা সম্ভব শরীরটাকে কুড়হার ভেতরে রেখে বসে পড়লাম। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শান্ত রাত। আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে মাঠের ওপর। শব্দহীন, সাড়াহীন অচেনা এক মায়াবী জগৎ যেন এই শীতের রাতে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে এসেছে।

ঘড়ি দেখলাম, রাত্রি সওয়া এগারোটা তখন। রামসিংয়ের কথা অনুযায়ী শুয়োর আসতে তখনও দেরী রয়েছে। তাই একটি সিগারেট ধরালাম। রামসিং ডানপাশে বসেছিল। সে তার মুখের ওপর থেকে

চাদরটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ক'টা বেজেছে ?' তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাল। বিড়িতে গোটা দুই টান দিয়ে সে বলল, 'সাব্, বহুৎ হুঁশিয়ার। শুয়োররা আমাদের দেখতে পেলেই তেড়ে আসবে। তখন যদি গুলি না করতে পারেন তবে জান নিয়ে টানাটানি হবে।'

আমি চুপি চুপি অথচ বেশ কড়াভাবে তাকে এক ধমক দিলাম, 'তুমি কথা বোলো না। সে যা হয় আমি বুঝব।'

ধমকটায় কাজ হল। রামসিং ভীত বিহ্বল দৃষ্টিতে দু'-চারবার এদিক ওদিক তাকিয়ে, বিড়িটা শেষ করে হাঁটু মুড়ে বসে, তারপর মাথা গুঁজে ঝিমুতে লাগল। ক্রমশ সাড়ে এগারোটা বাজল। এতক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসে আমার হাঁটুতে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। আমি ডান পা-টা সামনের একটা মোটা কাঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে বসলাম। শীতে তখন হাত পা যেন অবশ হয়ে আসছে। পর্যাপ্ত গরম পোশাক গায়ে থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল যেন আমাকে কেউ বরফের চাদর ঢাকা দিয়ে রেখেছে। হাত জমে গেছে। সেই ছাইচাপা আগুনে মাঝে হাতটা সেঁকে নিতে তবে হাতের সাড় ফিরে আসছে। আকাশের দিকে দেখলাম—চাঁদ বেশ ওপরে উঠে গেছে। তবে ধানক্ষেতের জলে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে যে সামান্য আলো চোখে পড়ছে তাতে সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য এতে ভয়ের কিছু ছিল না,—এ তো আর বাঘ শিকার নয়।

পৌনে বারোটার সময় আমি একটু চিন্তান্বিত হলাম শুয়োর কি সময় নিষ্ঠা রক্ষা করবে ; কিছু আগেও আসতে পারত,—না, রামসিং আজ রাতটা আমাদের দিয়ে ক্ষেতে পাহারা দিইয়ে নিল। আশা নিরাশার মধ্যে সময় কাটছিল, অবশ্য একটা প্রচণ্ড প্রতীক্ষায় যে অধীর হয়ে

উঠেছিলাম তা নয়। শুধু ভাবছিলাম, সত্যিই শুয়োর আসবে কি না। এইভাবে আরও মিনিট দশেক কাটবার পর দূরে হট্টিটি পাখির ডাক শুনলাম। রাত্রে জানোয়ার দেখতে পেলেই এই পাখিরা ডেকে ওঠে। সতর্ক হলাম, আশা জাগল মনে। পাখির ডাক ক্রমশ নিকটতর হতে লাগল। আমিও রাইফেলের বেল্টটা এমন করে রাখলাম যে কোনো মুহূর্তে শব্দ না করেই গুলি ছুঁড়তে পারব। কিন্তু ঐ ফাঁকা মাঠে পাখির ডাকগুলো এমনভাবে প্রতিধ্বনি হতে লাগল যে জানোয়াররা ঠিক কোন দিক দিয়ে আসছে সেটা অনুমান করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

আরও কিছু সময় কাটল। হঠাৎ কুড়হার পেছনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে দেখি আলের ওপর দিয়ে গোটা ছয়েক বড় বড় শুয়োর আসছে আমাদের দিকে, জ্যোৎস্না রাত্রে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের। আমি প্রস্তুত, শুধু ছড়ানো ডান-পা-টা মুড়ে হাঁটু গেড়ে বসেই ফায়ার করব। রাইফেলটা কোলের ওপর থেকে তুলতে গিয়ে রামসিংয়ের গায়ে ধাক্কা লেগেছিল, আমি সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি নি তখন। কিন্তু যেই ছড়ানো ডান-পা-টা কাঠের ওপর থেকে তুলতে গেছি, রামসিং কাঠের ওপর আমার হাঁটু দু'হাতে চেপে ধরে ভয় পাওয়া কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হু—জৌ—রা।'

মুহূর্তের জন্য আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। তবুও সেই অবস্থাতেই রামসিংয়ের মোষের বাচ্চার মতো বড় শুয়োরের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাইফেলের নলটা তাদের দিকে তাক করলাম। কিন্তু শুয়োররা ঐ চিৎকার শুনে কি আর থাকে, তারা লেজগুলো পাকিয়ে ছুট লাগাল। এদিকে আমার হাঁটু ভাঙবার দাখিল। যত বলি পা ছাড়, রামসিং সে কথা শোনে না। শেষ

পর্যন্ত রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে, দু'হাত দিয়ে রামসিংয়ের হাত ছাড়িয়ে আমার পা-টা বাঁচালাম, বললাম, 'তোমার ভয় নেই, আমাকে ছেড়ে দাও।'

পা ছেড়ে রামসিং তখনও ভয়ে কাঁপছে। আমি হতাশ হয়ে বসে ভাবছি সমস্ত ঘটনাটা। এমন সময় দেখি আলের ওপর একটা একলা শুয়োর, আমার থেকে কুড়ি পঁচিশ গজ দূরে। এ সুযোগ আর ছাড়ব না,—আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় লাগানো স্পট্ লাইটটা জ্বাললাম। শুয়োরটা এক লাফে আল থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ছুটলাম তার সঙ্গে। কিছু দূর এসে দেখি সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে, স্পট্ লাইটে তার লালচে চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু জ্যোৎস্নাতে স্পট্‌লাইট ভাল কাজ না করায় তার দেহের কোনো অংশই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু আমি আন্দাজে গুলি ছুঁড়লাম।

গুলি করার পর চার পাঁচ সেকেণ্ড কিছুই দেখলাম না। শুধু তখন রাইফেলের শব্দটা সেই বিস্তৃত মাঠের ওপর দিয়ে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে বহুদূর চলে যাচ্ছিল। চেতনা ফিরে আসতেই শুয়োরটা যেখানে ছিল সেইখানে ছুটে গেলাম, কিন্তু কিছু নেই। স্পট লাইটটা ফেলে আশে পাশে দেখতে লাগলাম, হঠাৎ শুনলাম একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ। সে দিকে আলো ফেলতেই দেখি সেই লালচে চোখ দু'টো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সময় নষ্ট না করে আর একটা গুলি ছুঁড়লাম, শব্দে বুঝলাম শুয়োর এবার ধরাশায়ী হয়েছে। ছুটে গেলাম তার কাছে, দেখলাম প্রথম গুলিতে তার সামনের একটা পা ভেঙে গেছে, দ্বিতীয়টা বিঁধেছে তার বুকে।

রাইফেলের আওয়াজ শুনে রফি আর রামসিং এসে হাজির

হল আমার কাছে। রামসিং শুয়োরটা দেখে বলল, 'এইটেই সেদিন জান নিয়ে নিচ্ছিল আমার।'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'তুমি আবার কথা বলছ কি, ভীতু কোথাকার, ক্ষত্রিয়দের কলঙ্ক।'

রামসিংয়ের মুখের ঢাকা এবার নামানোই ছিল, সে হাতজোড় ক'রে সেই একটা কথাই বলল, 'হুজৌর।'

শিকার কাহিনী মাত্রই কিছুটা উত্তেজনার, এক ঘেয়ে পড়তে পড়তে ভাল লাগে না। এবার তাই একটা হাসি মেশানো গল্প বলি, এক-ঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

....

রূপকুব জঙ্গলে
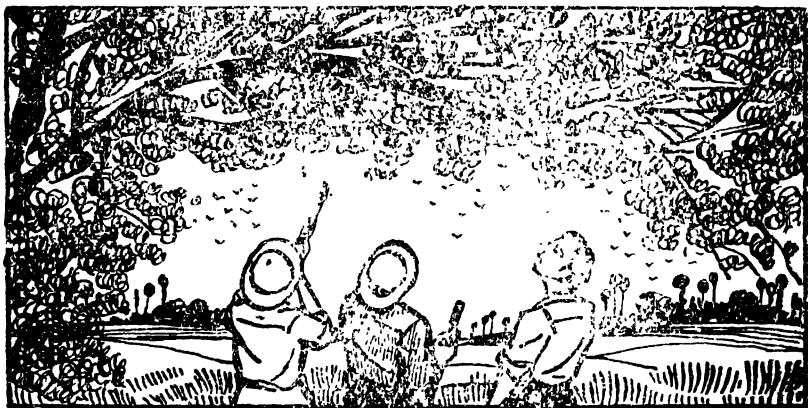
শিকার কাহিনী

....

একবার শীতে রাঁচী বেড়াতে গিয়েছি। একটা রাইফেল ঠিক সঙ্গে রয়েছে। কারণ আমার ধারণা কলকাতার রাস্তা ঘাটে বেরুলে

যেমন ট্যাকে কিছু পয়সা নেওয়ার দরকার, তেমনি রাঁচী হাজারিবাগ অঞ্চলে গেলে দরকার রাইফেল বা বন্দুকের।

রাঁচীতে পা দিলেই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সব এসে জুটে হৈ-হল্লা করে, দিন ক'টা খুব হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। কিন্তু আমার সঙ্গে তাদের মনের মিল হয় না ; সমবয়সী অন্যান্য সকলেই প্রায় থিয়েটার বা রবীন্দ্র সঙ্গীত এসব নিয়ে মেতে থাকে, কিন্তু শিকারের নাম শুনলেই দশ-পা পিছিয়ে যায়। অথচ শিকারী বন্ধু রায় ক'দিন ধরে খবর দিচ্ছিল যে, রূপকর বস্তীতে একটা চিতাবাঘ রোজ হানা দিচ্ছে।

রাঁচী গিয়ে এদের সহযোগিতা বা উৎসাহ না পেয়ে যতটা না মন খারাপ ভাব, তার চেয়ে বেশি ভয় হয় এদের পাল্লায় পড়ে এতদিনের শখটাই না জলাঞ্জলি দিয়ে বসি। দিনরাত এ-সব চিন্তা অনবরত মাথায় আমার। শেষ পর্যন্ত একদিন মরিয়া হয়ে বাজারের কাছে গিয়ে একটা স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করলাম। বন্ধু-বান্ধব সমবয়সীদের মধ্যে একমাত্র উৎসাহী বঙ্কেকে খবর দিলাম।

সেদিন শনিবার। সকলে অফিস থেকে ফিরে এসেছে। বাড়িতে লুচি-মাংসের আয়োজন দেখে অনেকেই লুব্ধ। তারপর আমার শিকারের প্ল্যান শুনে হঠাৎ সাতু আর বাঁশি আমার কাছে এসে সটান বলে বসল, 'আমাদের সঙ্গে নিতে হবে।'

বললাম, 'সে কি এতদিন বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল একটা ব্যবস্থা কেউ করতে পারলে না। আর আজ যখন নিজে কষ্ট করে সব বন্দোবস্ত করেছি, অমনি মাংস লুচি দেখেই শখ চেপে বসল। যাও, বাছাধনরা হারমোনিয়াম নিয়ে নদীর ধারে বসে গান গাও গে। শিকার-ফিকারে তোমাদের যেতে হবে না। কিন্তু আমার কথায় আর কান দেবে কে! সেজে বসল নিজেরাই। শুধু এই এক জ্বালাই

নয়, সাতু এসে আবার বলল, 'তার কে এক বন্ধু, সুজিত নতুন বন্দুক কিনেছে, সেও যাবে আমাদের সঙ্গে।' ঝুট ঝামেলা নিয়ে আর যাই হোক শিকারে যাওয়া চলে না। বাধ্য হয়ে ওকে থামাবার জন্য বললাম, 'আমি কীর্তন গাইতে যাচ্ছি, যে যত লোক পারি জুটিয়ে নিয়ে যেতে হবে—'

এ-কথায়ও ওদের উৎসাহ কমল না—ফলে যাত্রার আগেই আমার শিকারের আশা নিবল। ওদিকে বাড়ির মেয়েদের হাঙ্গাম বাড়ল। দু'জনের জায়গায় পাঁচজনের জন্যে খাবার ব্যবস্থা সে এক এলাহী কারবার—যেন চড়ুইভাতি করতে যাচ্ছি।

প্রবাদ আছে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—যাবার ঠিক ছিল বিকেলে, কিন্তু একজন আসে তো আর একজনের পাত্তা নেই। অপেক্ষা করে করে রওনা হতেই সন্ধ্যা পার হয়ে গেল।

রূপরুতে স্থানীয় এক লোকের বন্দোবস্ত করা ছিল। তার সঙ্গে দেখা হতেই বলল, 'রাস্তার পাশে একটা জায়গায় চিতা বাঘটা ক'দিন থেকে আসছে, সেখানে চলুন।'

ওর কথা মতোই সব ঠিক হল। এদিকে তিনটে রাইফেল ওদিকে একলা চিতাবাঘ, ভাবনার বিষয় হল ভাগে পোষাবে কি করে। যা হোক ঠিক করলাম রায় আমি মহড়া নেব, সুজিত থাকবে সাহায্যকারী রূপে। যদিও যে কোনো ভাল শিকারী মাত্রেই বুঝবেন যে আসলে আমরা শিকার নিয়ে ছেলেখেলা করছি, যার এখানে কেবল আরম্ভের পর্ব। চিতাবাঘের নাম শোনামাত্রেই সাতু আর বাঁশি বলল, 'তোমরা শিকারে যাও—আমরা গাড়িতে আছি।'

আমি বললাম, 'সেকি এক যাত্রার পৃথক ফল—সে তো হতে

পারে না, নেমে পড় বাছাধনরা।' মনে মনে বললাম, এই শীতে আমরা জঙ্গলে বসে কাঁপব, আর তোমরা গাড়িতে বসে লুচি মাংস সাঁটবে আর ঘুম দেবে তা হচ্ছে না।

অনেক টানা-হেঁচড়ায় বাধ্য হয়ে ওরা চলল আমাদের সঙ্গে। সাতু আমার সঙ্গে আর বাঁশি রইল রায়ের জিম্মায়।

রওনা হবার পর থেকেই দু'টিতে আমাদের পাশে সেঁটে রইল। সাতুকে পরীক্ষা করবার জন্য টর্চটা হাতে দিয়ে বললাম, 'এই ঝোপটার ওপাশে গিয়ে দেখে এস তো কিছু আছে কি না?'

না গিয়েই উত্তর দিল ও, 'ওখানে কিছু নেই—দেখে আর কি হবে।'

কিছুটা এগিয়ে গিয়েই সাতু একটা পাথর হাতে তুলে নিল। ওর ভাব দেখেই মনে হল, আমাদের ওপর তার আস্থা নেই। বিপদে অবলম্বন খুঁজছে। সারাটা রাস্তা বাঁশি কিন্তু গা ঘেঁষে চলছিল।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গাইড চিতার আগমন স্থান নির্দেশ করল। রায়কে কাছাকাছি খুব সম্ভাব্য জায়গায় বসিয়ে দিলাম। সঙ্গে বাঁশি রইল। কিছু দূরে একটা খাদ মতো স্থানে সুজিত আর আমি সাতুকে নিয়ে বসলাম। খাদটা ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। কিছু সময় কাটবার পর সুজিত একটা গাছে টর্চ ফেলে আমাকে ডাকল। তাড়াতাড়ি গেলাম কাছে, দু'টো জ্বলন্ত চোখ দেখিয়ে ও আমাকে বলল, 'লেপার্ড!'

আমি বললাম, 'গাছে?'

সুজিত উত্তর দিল, 'লেপার্ড গাছে ওঠে জানেন না?'

কথাটা সব শিকারীই জানে। আমার প্রশ্ন ছিল চিতার অবস্থানের। তবুও এই সবজান্তা শিকারীকে বেশি কিছু না বলে আত্মসম্মান রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে বললাম, 'যাও তুমি আর সাতু দু'জনে মিলে ওটাকে মার। আমি এখানে আছি।'

সাতু গেল না, আমার সঙ্গেই থাকল। উপরন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাইফেলে গুলি ভর্তি আছে?'

উত্তর দিলাম, 'বাঘ না দেখে গুলিভরা বিপদজনক—দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

সাতু এবার অনুযোগের সুরে বলল, 'রাইফেলে গুলি নেই বাঘ এসে পড়লে তো আরো বিপদ!'

'তাতে খুনের দায়ে পড়বে বাঘ, আমি নয়।' আমি একটু রসিকতা করেই বললাম।

সুজিত ওদিক থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'রেডি থাকবেন, বাঘ গাছ থেকে নেমে—ঝোপের মধ্যে ঢুকেছে এখন।'

এই কথা শুনে ভয়ে সাতু মনস্থির করতে পারছে না। একবার আমার সামনে, একবার পেছনে এসে বসেছে। আর বার বার বলছে, 'আপনি দয়া করে রাইফেলে গুলি ভর্তি করুন।'

বলাই বাহুল্য এ-ধরনের অস্থির চিত্ত ও ভীতু লোক নিয়ে শিকারে কখনোই যাওয়া উচিত নয়—বা এরা সঙ্গে আছে বলেই প্রয়োজন ছাড়া রাইফেলে গুলি ভর্তি করে রাখতে নেই।

ওর কথায় আমি কান দিলাম না। ফলে আমার উদাসীনতায় সাতু বিরক্ত হল। বলল, 'এর থেকে গাড়িতে থাকলে অনেক ভাল হত।'

ওদিকে সুজিত বাঘের ব্যাপার নিয়ে খুব সিরিয়স হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে বলছে, 'বাঘ একবার গাছে উঠছে আবার নামছে আর গোঁ গোঁ করে ডাকছে।'

'এবার দেখলেই গুলি ছোঁড়।' আমিও বললাম।

কথা মতো সুজিত গুলি ছুঁড়ল। গাছের ওপর চোখ জ্বলছিল।

গুলি ছুঁড়তেই ঝটপট করে শব্দ হল। রায় ও বাঁশি শব্দ পেয়ে দৌড়ে এল। সকলে সুজিতের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুজিত খুব খুশি হয়ে বলল, 'দেখুন ব্যাটা মরে গাছে ঝুলছে।'

রায় তো তাই দেখে হেসে অস্থির। কোনো রকমে হাসি থামিয়ে বলল, 'ওটা বাদুড়।'

গম্ভীর হবার ভান করে রসিকতা করে বললাম, 'কখনো না, সুজিত চিতার গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনেছে, ওটা বাদুড় কি করে হবে?'

স্থানীয় লোকটা এসে সমস্ত রসভঙ্গ করে বসল, 'উ তো বাদুড় হ্যায়।'

একটা হাসির হররা উঠল জঙ্গলে। হাসির ব্যাপারে সাতু আর বাঁশি মেতে উঠল। হো হো করে হাসতে লাগল। এই হাসির শব্দে বাঘ তো দূরের কথা, বাঘের চোদ্দপুরুষও পালালো আমাদের ছেড়ে।

সে রাতের মতো বাধ্য হয়ে শিকারে ইস্তফা দিলাম। যথেষ্ট হয়েছে, আর বাঘ মেরে কাজ নেই। রাত বারোটা। বাড়িতে ফিরে ভোজনে মন দেওয়া গেল। এ ব্যাপারে সাতুর উৎসাহ অনবদ্য। তাই দেখে বললাম, 'খাওয়ার ব্যাপারে দেখছি তুই সবার আগে, অথচ যুদ্ধের সময় পশ্চাতে।'

বাঁশি রসিক লোক। সে বলল, 'আসলে আমরা এসেছিই এই মাংসের টানে—শিকারের লোভে তো নয়।'

আরো দু'তিন জায়গায় সে রাত্রে রায়কে নিয়ে ঘুরলাম, কিন্তু কিছু হল না। তবে ওরা তিনবন্ধু আর গাড়ি থেকে নামে নি। অবশ্য আমি তাতে কিছুই মনে করি নি—তার কারণ গাড়ির খাবার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই।

চৌপারনে থাকা কালীন হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল খাবার জন্যে কোনো মাংস নেই। প্রায় রাত্রেই বাংলোর পাশে ক্ষেতি থেকে পয়েন্ট টু-টু দিয়ে একটা করে খরগোস মেরে তাই মধ্যাহ্ন ভোজন

....

শিকারে যেমন মজা তেমন বিপদ

শিকার কাহিনী

....

হত। আগের দিন সন্ধ্যায় শিকারে যাওয়ায় খরগোস মারা হয় নি। তাই সকালের চা শেষ করেই আমি আর শচীন বেরিয়ে

পড়লাম, কাছাকাছি কোথাও যদি হরিয়াল বা অন্য কিছু পাওয়া যায়।

খানসামা খবর দিল, 'বাংলোর পেছনের জঙ্গলে একটু ভেতর দিকে তিতির মিলবে।'

শচীনের খুব শখ তিতির মারবার; বলল, 'চল তবে তিতিরই মেরে আনা যাক।'

বিমল বিদ্রূপ করল, 'হ্যাঁ, শচীন আবার তিতির মারবে।'

শচীনের জেদ আরও বাড়ল। উত্তর দিল, 'আজ তোকে তিতির মেরে দেখাবই।'

জঙ্গলে বেশি দূর যেতে হল না। তিনটে তিতির পাশ দিয়ে উড়ে একটা ঝোপের ধারে বসল। শচীন সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল। দু'টো উড়ে গেল। একটা জখম হয়ে পাক খাচ্ছিল। শচীন বলল, 'বিমল খুব যে বলেছিল তিতির শিকার আমার দ্বারা হবে না, কিন্তু এখন!'

'সে কথা পরে হবে, তুমি আরেকটা গুলিতে ওটাকে খতম কর আগে।'

আমার উত্তরে বিমল বলল, 'তুমি কি ক্ষেপেছ! আর একটা গুলি।' কথা শেষ করে বিমল তিতিরটা আনতে গেল। কিন্তু হা ভগবান! তিতির নেই—কখন এক ফাঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

পুরো এক ঘণ্টা খোঁজা হল। আশ-পাশের ঝোপঝাড় তোলপাড় করেও সেই অর্ধ মৃত তিতিরকে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। শচীনকে বললাম, 'ওহে আজ চল, কাল না হয় খবরের কাগজে নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখব কি হয়।'

শচীনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুকনো মুখে হতাশ হয়ে সে বাংলোয় ফিরল। তিতিরের অভাবে ভাগ্যে শুধু আলুর ঝোল আর

ভাত জুটল। বিমলকে শচীনের ব্যাপার খুলে বলতে ও বলল, 'বেশ হয়েছে! খুব বেঁচে গেছি আর একটু হলেই ও আমাকে শিকারে হারিয়ে দিত; আমারও ঠিক এই দশা হয়েছিল।'

বিমল তার কাহিনী শুরু করল। কল্যাণী থেকে একটু ভেতরে শিকার করতে গিয়েছি। কিছু দূর গিয়েই দেখি তিনটে বেশ বড় বড় তিতির চরছে। তাই না দেখে সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলাম। ঠিক এ-রকম দু'টো উড়ে গেল। একটা ছটফট করতে লাগল মাঠের ওপর। গুলির মায়ায় আর না মেরে ছুটে গিয়ে জ্যান্ত ধরে তাকে গাড়িতে রেখে দিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর আবার সেই জায়গায় ফিরে সামনে একজন চাষীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদিকে তিতির পাওয়া যাবে কি?'

সে উত্তর দিল, 'তিনটে বেশ বড় তিতির তো আছে এখানে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ মারতে পারে নি তাদের।'

গর্বিত হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জানালাম, 'ওই তিনটের একটাকে দেখবে—' বলে মটরের পেছনের দরজা খুলে যে না তিতির দেখাতে গিয়েছি অমনি আমার চোখের সামনে দিয়ে সে উড়ে গেল জঙ্গলে। আমি হতভম্ব। চাষী বলল, 'কি হল মশাই, পাখি কই?'

সমস্ত গর্ব ধুলো হয়ে মাটিতে মিশল। শুধু বললাম, 'দেখ ভাই, গত একঘণ্টা আধমরা হয়ে গাড়িতে ছিল—এরপর জ্যান্ত হয়ে উড়ে যাবে কল্পনাও করি নি। এখন দেখছি তোমার কথাই ঠিক।'

বিমলের কথা শেষ হলে আমি বললাম, 'শচীনকে আমি আরেকটা গুলি করে পাখিটাকে শেষ করতে বলেছিলাম, কিন্তু ও আমার কথায় কানই দেয় নি উল্টে হো-হো করে হেসে উঠেছিল। ফলও তাই তেমনি হয়েছে।'

শচীন তখন 'পরশুরামে'র কেরসিন ব্যাণ্ডের মাস্টার লটবর নন্দীর মত 'ও হো হো' করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

ওটা যেমন মজার ঘটনা হল, তেমনি বিপদেরও একটা কথা মনে পড়ছে। আমার এক আত্মীয় দেবীদা—স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, সেই আমলে পুলিশের নাক ফাটিয়েছেন এক ঘুষিতে। মারামারির কোনো ব্যাপার তাঁর সামনে হলে রক্ষে নেই, তিনি মহড়া নেবেনই—তা ফুটবল খেলা নিয়েই হোক বা দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে। তাঁর সাহস যে আমার চেয়ে অনেক বেশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার সঙ্গে তিনি একবার পালামৌতে শিকারে যান। তাঁর কোনো বন্দুক নেই। ওখানে গিয়ে একটা লাঠিকে একদিন একদিকে ছুঁচলো করে রাখলেন। তাই দেখে আমি বললাম, 'এটা কি হবে?'

'এদিকে যা জঙ্গল দেখছি—' দেবীদা উত্তর দিলেন। 'কোন ঠিকানা কি বিপদ হয়—তাই কাছে একটা হাতিয়ার থাকা ভাল।'

দেবীদার মনের জোরও অসম্ভব। হরিণ শিকার নিয়ে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আমাদের কথা কাটাকাটি হল; তারা আমাদের শাসিয়ে গেল। সঙ্গে বন্দুক রাইফেল থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটায় আমি একটু ভয় পেলাম। সঙ্গে ছোড়দা ছিল। দেবীদা প্রথম থেকেই আমার ভয় ভাবটা ধরে ফেলেন। বললেন, 'দেখ যে সাহসী সে একবারই মরে—ভীতুর মরণ প্রতি পদে।'

কথাটা সেদিন সময়োপযোগী ভাল লেগেছিল। এখনো কোনো ভয়ের ব্যাপার হলেই আমি দেবীদার উপদেশ স্মরণ করে থাকি।

এ হেন দেবীদাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন একটা পুকুরে হাঁস মারতে গিয়েছিলাম। পুকুরটায় অনেক বেলে হাঁস ছিল। প্রথম ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গেই চারটে জলে পড়ল। বাকীগুলো উড়ে গেল ভয় পেয়ে। সমস্ত পুকুরটা ভর্তি পদ্মবন আর দামে। হাঁস চারটে প্রায় পুকুরের মাঝখানে। বাধ্য হয়ে হাঁসগুলো তুলবার জন্য একটা লোক ডাকতে গেলাম কিন্তু তখন কাউকে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। দেবীদা তাই দেখে বললেন, 'এই চারটে হাঁস ওঠাবার জন্য এত ভাবনা কিসের—আমিই এনে দিচ্ছি।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'অচেনা পুকুর, কোথায় কি আছে—শেষে একটা কিছু ঘটে গেলে মুশকিল।'

দেবীদা ধমক দিয়ে বললেন, 'তোর যত ভয়—জানিস আমি সাঁতরে গঙ্গা পার হয়েছি।'

দেবীদা নামবার জন্য তৈরী হলেন। তবু ছ'-একবার বলতে গেলাম, 'পুকুরটা দামে ভর্তি সাঁতারের সুবিধে নেই পা জড়িয়ে যেতে পারে।

আমার কথায় কান না দিয়েই দেবীদা নেমে পড়লেন জলে। তাই দেখে তাড়াতাড়ি পাশের মাঠ থেকে ভাগ্যি দশ-বারো হাত একটা বাঁশ পেয়ে কুড়িয়ে আনলাম। এসে দেখি হুলুস্থুল কাণ্ড। দেবীদা আর সাঁতরে যেতে পারছেন না—ফিরতেও না। ছোড়দার সাহায্য চাইছেন। ছোড়দা হাঁটু জলে নেমে আর এগুনো উচিত কিনা ভাবছে। দূর থেকে তাই দেখে ছুটে এসে বাঁশটাকে ছোড়দার হাতে দিয়ে বললাম, 'দেবীদার দিকে এগিয়ে ধরো।'

ছোড়দাকে আমি শক্ত করে ধরে—যাতে দেবীদার টানে সে সরে না যায়। ছোড়দা একটু নেমে বাকীটা ঝুঁকে পড়ে দেবীদার কাছে বাঁশটা পৌঁছে দিল। দেবীদা চেপে ধরতেই আমরা ছ'জনে তাকে

পাড়ের দিকে টানতে লাগলাম, ঠিক মাছ ধরার মতো করে। দেবীদার তখন সাঁতার কাটবার ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন—কোনো রকমে কাছে আসতেই হাতে ধরে তুলে নিয়ে পাড়ে শুইয়ে দিলাম। প্রায় অচৈতন্য অবস্থা। সামান্য সময়েই দেবীদা সুস্থ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আর একটু হলে কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডটাই ঘটত। আমি প্রায় বাঁচবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'এ রকম বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে—' উত্তরে বললাম, 'দামে পা জড়িয়ে লোক ডুবে গেছে, অথচ এক টুকরো দড়ি বা বাঁশ হলেই এই বিপদ থেকে বাঁচা যায়—এখন তো এই বাঁশই কাজ হাশিল করল।'

পরে এক স্থানীয় লোক এসে তিন হাত লম্বা এক টুকরো তক্তার ওপর বুক রেখে অনায়াসে টুক করে হাঁসগুলো এনে দিল। ভাবলাম, কি বোকামীই না করেছি।

সেবার শীতকালে রাঁচীতে গিয়েছিলাম—ইচ্ছে ছিল ওখানে হেড কোয়ার্টার করে চারপাশের জঙ্গলে শিকার করব। স্থানীয় দু'চারজন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সন্ধ্যায় চায়ের মজলিসে এই নিয়ে প্ল্যান ও

রেঞ্জার বন্ধু
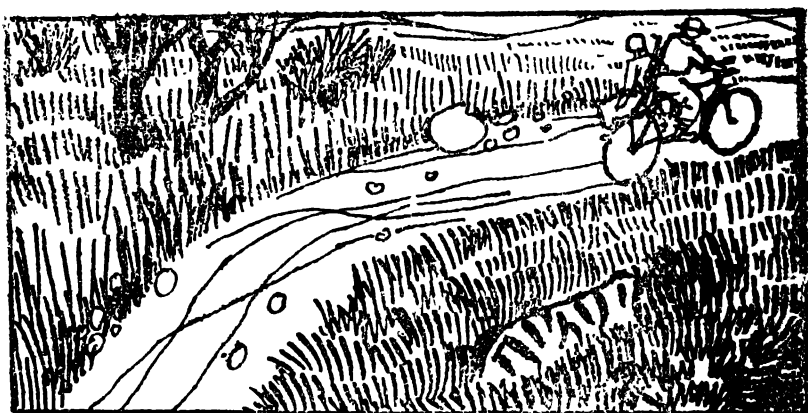
শিকার কাহিনী

আড্ডা জমত। কোনোদিন আবার তাসখেলার নেশায় চাপা পড়ে যেত। কিন্তু পরের দিন সকালে ঘুম থেকে চোখ খুলে বন্দুকগুলো

নজরে পড়লেই মন খারাপ লাগত—কিন্তু উপায় বা কি! বন্দুক কাঁধে করে রাঁচার আশ-পাশের ছু'-তিন মাইল ঘুরলেও একটা পাখি মিলবে না। এ-রকম জায়গা এর আগে দেখি নি।

বেকার গুলতানি করে আট দশদিন কেটে গেল। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় আমার এক বন্ধু সঙ্গে অচেনা এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসে হাজির। সেদিন লোক তেমন বেশি নেই। বাইরে কড়া শীত। ঘরের ভেতর হাত-পা গুটিয়ে ফরাসের উপর বসে শরীর গরম করছি। আর ঘন-ঘন চা খাচ্ছি। বন্ধুটি আর ভদ্রলোককে দেখে আবার নতুন করে চা'র ফরমাস হল। বন্ধুবর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি মিস্টার মজুমদার। আমার বিশিষ্ট বন্ধু।'

'বসুন, পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।' প্রতি নমস্কার করলাম।

তাস শুরু হয়ে গেল। মিস্টার মজুমদার খেলায় অভ্যস্ত নন। তিনি দেখছিলেন বসে। হঠাৎ ঘরের ভেতর সাজানো বন্দুকগুলো দেখে তিনি বললেন, 'কি মশায়, আপনার শিকারের শখ আছে নাকি! সাবধান মশায় এ শখ ছাড়ুন।'

হঠাৎ আলাপে এ রকম সিরিয়স উপদেশ উনি দেবেন ভাবাই যায় না। তার উপর আমাকে শিকারের ব্যাপারে কেউ নিরুৎসাহ করলে বিরক্তি লাগে। মিস্টার মজুমদারের কথাতেও বিরক্ত হলাম। তবু যথাসম্ভব মুখে হাসি টেনে বললাম, 'কেন, হঠাৎ এ-কথার কারণ কি?'

'কারণ—শুনবেন?' ভদ্রলোক শুরু করলেন, 'যা দেখেছি তা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়, হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায়। ওঃ ভগবান!'

'দয়া করে বলুন—কি দেখেছেন!'

বিরক্তি ভাব কাটিয়ে কৌতূহল মিশ্রিত সুরে বললাম।

মজুমদার উত্তরে বললেন, 'সে এক কাহিনী—আপাতত থাক। তবে শিকার যদি একান্ত না ছাড়তে পারেন বাঘ শিকার অন্তত ছেড়ে দিন।'

বাঘের কথায় কৌতূহল আরও বাড়ল। সকলেই বললাম, 'বলুন মশায় আপনার কাহিনী।'

এত লোকের অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না তিনি। শুরু করলেন তাঁর কাহিনী, 'আমার এক বন্ধু ছিলেন পালামৌ অঞ্চলের ফরেস্ট রেঞ্জার। এক জঙ্গলে তখন কাজ হচ্ছিল; সে লিখল যে তার বাংলোটা খুব চমৎকার—জায়গাটাও খুব নির্জন, স্থানীয় দৃশ্য অতি মনোরম। চিঠির শেষে অনুরোধ—দিন সাতেক তার সঙ্গে ওখানে গিয়ে থাকলে সে খুব খুশি হবে। আমন্ত্রণ পেয়ে আমিও খুশি হলাম। হাতেও তেমন কাজ নেই। একদিন রামগড় স্টেশন থেকে গোমো ডাল্টনগঞ্জ-এর ট্রেনে উঠে বসলাম। সাড়ে তিনটে নাগাৎ গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনে বন্ধুবর উপস্থিত ছিল। সঙ্গে ফরেস্ট গার্ড।

স্টেশন দেখেই অনুমান করা যায় জায়গাটা খুব নির্জন। কেমন এক শান্ততার শ্রী মাখানো। স্টেশনে একাই যাত্রী হিসেবে নামলাম। অভ্যর্থনার পর বন্ধুটি বলল, 'তোর মালপত্তর ফরেস্ট গার্ডের কাছে দে—ও গরুর গাড়িতে নিয়ে যাবে। আমার সঙ্গে সাইকেল আছে—তুই ওর সাইকেলটা নে।'

আমি রাজী হলাম। গরুর গাড়িতে কোমর ব্যথা করার চেয়ে সাইকেল ঢের ভাল। কিন্তু গার্ড রাজী হতে চায় না। সে বলল, 'হুজুর মানুষখেকো বাঘটা এই কাছাকাছি জঙ্গলেই ঘোরাঘুরি করছে।

তার চেয়ে চলুন সবাই গরুর গাড়িতে যাই। সাইকেলে যাওয়া নিরাপদ হবে না।'

বন্ধুটি ধমকে দিল, 'ভয় কিরে—' কাঁধের দোনলা বন্দুকটা দেখিয়ে বলল, 'যতক্ষণ এটা সঙ্গে আছে বাঘকে থোড়াই কেয়ার।'

এমনি বাঘই যথেষ্ট, তার উপর মানুষখেকোর কথা শুনে বেশ ভয় পেলাম। কোমর ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে বললাম, 'যখন বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে তখন এক সঙ্গেই যাওয়া যাক—'

বন্ধুটি উত্তর দিল, 'সাত মাইল তো রাস্তা—খুব বেশি সময় লাগলে দেড় ঘণ্টা। সাড়ে তিনটে এখন—পাঁচটার মধ্যে বাংলোয় পোঁছে যাব। ভয়ের কিছু নেই।'

বন্ধুর ওই দোনলা বন্দুক দিয়ে বাঘ মারার অনেক গল্প আর সাহসের কথা শুনেছি। তার বন্ধু হিসেবে আমার এই সামান্য ভরসা না পাওয়ার ব্যাপারটা খুবই লজ্জার বলে মনে হল। তাই আপত্তির কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না। সময় নষ্ট না করে সাইকেলে চেপে বসলাম।

স্টেশন থেকে কিছু দূর রাস্তাটার দু'পাশে বস্তী—তারপরই একটানা জঙ্গল। শাল মহুয়ার ঘন অরণ্য। রাস্তাটা যদিও ভাল—চড়াই-উৎরাই-এ ভর্তি। গল্প করতে করতে দু'জনে যাচ্ছি—হঠাৎ এক চড়াইয়ের মাঝপথে বন্ধুর সাইকেলের চেনটা ছিঁড়ে গেল। কি করা যায়—ভাবনায় পড়া গেল। শেষ পর্যন্ত সাইকেলটায় ওর একটা রুমাল বেঁধে রাস্তায় ফেলে রাখা হল। ফরেস্ট গার্ড দেখলেই চিনে নিয়ে গাড়িতে তুলে নেবে। এ রাস্তায় লোক চলাচল নেই। সুতরাং সাইকেল হারানোর সম্ভাবনা ছিল না। এবার এক সাইকেলেই দু'জনে চললাম। বন্ধু চালাচ্ছে, আমি পেছনের ক্যারিয়ারে বসে।

আমাদের হিসেব করা সময় এমনিতেই কিছুটা নষ্ট হল, তার উপর ছু'জনে এক সাইকেলে চড়াতে গতিও কমে গেল। মাঝ-রাস্তাতেই সূর্য ডুবে গেল। বন্ধু যথাসাধ্য দ্রুত চালাতে চেষ্টা করে কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপিয়ে পড়ল। তাই দেখে বললাম, 'এবার আমি চালাই।'

'না, আর দরকার নেই,' ও বাধা দিল। বলল, 'তবে জানিস—একটা মুশকিলে পড়ে গেলাম।'

'কেন, কি হয়েছে?' আমি প্রশ্ন করি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'সেই মানুষখেকোটা আমাদের পিছু নিয়েছে।'

কথাটা শুনেই আমার অজ্ঞান হবার অবস্থা। সে আবার বলল, এখন অবশ্য ভয় নেই, কিছু দূরে একটা 'ম্যানহোল' আছে—তার আগে সাক্ষাৎ হবে না।'

সান্ত্বনার বাণী আমার কানে কি আর ঢোকে তখন। ভয়ে চুপচাপ কাঠ হয়ে বসে রইলাম। বন্ধু যেন বাঘের মনের কথা বুঝতে পেরেছে। ছু'একবার আমি বলতে গেলাম, সাইকেল ছেড়ে সুবিধে মতো একটা গাছে উঠে পড়ি, গার্ড এসে গরুর গাড়িতে এক সঙ্গে যাক। বন্ধু আমার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। হয়ত সে অন্য কিছু ভাবছিল। বাধ্য হয়ে আমি চুপ করে গেলাম। ক্রমে আমরা ম্যানহোলের কাছে এলাম। বন্ধুর নির্দেশ মতো 'ম্যানহোল' থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে নামলাম। সাইকেল রাস্তায় পড়ে রইল। ছু'জনে কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছি। বন্ধু বলল, 'দেখ ব্যাটা বাঘ একটু পরেই ম্যানহোল থেকে বেরিয়ে আসবে।'

কথাটা সত্যি হল। বাঘ হয়ত হিসেব করে রেখেছিল একটা

নির্দিষ্ট সময়ে আমার ম্যানহোলের ওপর দিয়ে যাব—কিন্তু সে সময় পার হয়ে গেল। অথচ আমাদের পাত্তা নেই দেখে ম্যানহোলের ভেতর থেকে সে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আমরা যেদিক থেকে আসছিলাম সে দিকে তাকালো। যেমন ভীষণ সেই চেহারা, তেমনি চাউনি। বোধ হল আমার পা দু'টো পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। বাঘের সৌন্দর্যের সুখ্যাতি প্রচুর শুনেছি—আমার কিন্তু সেটা দেখায় মনের আস্থা ছিল না—শুধু ভাবলাম সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে এক মূর্তিমান মৃত্যু। তার মুখে যেন বিরক্তি। মিনিট খানেক কাটল। পাথরের মতো আমি দাঁড়িয়ে—বন্ধুটিও চুপ করে আছে। বাঘের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। পরে সে এক লাফে ম্যানহোলের উঁচু মাথায় উঠে আমাদের রাস্তার মাথায় বসল। আমাদের দেখা না পাওয়ায় তার মনের হতাশাটা যেন আমরা টের পেলাম। বাইরে তখনো হয়তো সূর্যের শেষ আলো ছড়িয়ে আছে—কিন্তু ঘন জঙ্গলের ভেতর এর মধ্যেই কিছুটা অন্ধকার নেমে এসেছে। এবার বন্ধুটি সামান্য নড়ল। আমাকে চুপি চুপি বলল, 'তুই এখানেই থাক, কোথাও নড়বি না। আমি নিজে ওর শেষ দেখে ছাড়ব।'

বন্দুকে গুলি ভরে গাছের আড়াল ছেড়ে সে রাস্তায় গিয়ে উঠল। একেবারে বাঘের মুখোমুখি। বাঘ এতটা আশা করে নি যে তার শিকার হঠাৎ শিকারী হয়ে দেখা দেবে। গাছের আড়াল থেকে বাঘটাকে দেখছি—বন্দুক দেখা যাচ্ছে না। বাঘের হুঙ্কারে বুঝলাম সে বন্দুক দেখতে পেয়েছে। আসন্ন সন্ধ্যায় নিবিড় জঙ্গলে সেই হুঙ্কারের শব্দ যে কী ভীষণ তা না শুনলে বোঝানো যায় না। যে বড় গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার মোটা গুঁড়িও যেন কেঁপে উঠল, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সে শব্দ বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হল। বাঘের বিরক্তি

হিংস্রতায় পরিণত হল—স্বল্প আলোতেও সেটা আমার চোখে পড়ল। শরীর কাঁপছে, আস্ফালন বাড়ছে প্রবলভাবে। তাই দেখে মনে হল বন্ধুটি পা-পা করে বাঘের দিকে বুঝি এগোচ্ছে। বাঘও সমানে গাঁক গাঁক করছে—তার হাবভাবে মনে হচ্ছে সে সুযোগ খুঁজছে। বিপদের ব্যাপারটা যেন সেও খানিকটা অনুমান করেছে—তবু ভয় না করে সে বন্ধুর চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বাঘ মাটিতে ল্যাজের ঝাপটা দিতে শুরু করল। কবে যেন শুনেছিলাম লাফ দিয়ে আক্রমণ করবার আগে বাঘ মাটিতে ল্যাজ ঝাপটায়। সে কথা মনে পড়ায় বুঝলাম এবার বাঘ লাফাবে। কিন্তু বন্ধু কই? সাহসে ভর করে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বন্ধুও প্রস্তুত। খুট করে এক শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে দিয়ে বিরাট কি যেন তীরের বেগে চলে গেল। দেখি বন্ধু অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর তার বন্দুকটা রাস্তার ওপর গড়াচ্ছে। এই পর্যন্ত মনে ছিল, তারপর আর কিছুই জানি না।

যখন চোখ খুললাম,.দেখি ফরেস্ট গার্ড আর গাড়োয়ান পাঁজকোলা করে আমাকে গাড়িতে তুলছে। আমি তাকাতেই গার্ড বলল, 'সাব্ কাঁহা?'

সব ঘটনা খুলে বললাম। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'বাঘে নিয়ে গেছে', কথাটা বলতে ঠোঁট কেঁপে উঠল। চোখ জলে ভরে গেল। বললাম, ওর বন্দুকটা রাস্তায় পড়ে। ওটা নিয়ে তোমরা এখনো খোঁজ করলে ওকে বাঁচাতে পারবে।

ফরেস্ট গার্ড টর্চ জ্বেলে বন্দুকটা কুড়িয়ে আনল, আমার সামনে খুলে দেখল গুলি আছে কিনা। বলল, 'সাব্ ফায়ার করেছিল—আফশোষের

কথা যে গুলি ছোটে নি। আমারও সেই 'খট' শব্দটার কথা মনে পড়ল। গাড়োয়ানকে তাড়াতাড়ি চালাতে বলে গার্ড বলল, 'সাহেবের নিশানা ভুল হয় না—গুলি চললে ওই বাঘ আজ মারা পড়তই।'

আমরা আধঘণ্টায় বাংলোয় পৌঁছুলাম। ফরেস্ট গার্ড তখনই আট-দশজন লোক নিয়ে মশাল জ্বেলে টাঙ্গি হাতে বেরিয়ে পড়ল। একজন লোক আমার কাছে রইল, আর রইল গাড়ির গাড়োয়ান। ওরা চলে যাবার পর গাড়োয়ান বলল, 'চেন কাটা সাইকেলটা তারা গাড়িতে তুলে নিয়ে আসতে আসতে দ্বিতীয় সাইকেলটাও রাস্তায় দেখে। তাই দেখে ওরা এদিক ওদিক খুজতে খুঁজতে পাশের জঙ্গলে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছে।'

আশা নিরাশায় সারা রাত জেগে কাটল। মনে উদ্বেগ। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বাঘ নিশ্চয়ই এখনো ওকে মেরে ফেলে নি! এইসব ভাবতে ভাবতেই ভোরের আলো ফুটে এল। অনুসন্ধানকারী লোকরাও ফিরে এল। ওদের কোলাহলে বাইরে ছুটে এসে দেখলাম বন্ধুর আধখাওয়া মৃতদেহটা ওরা বয়ে এনেছে। সেই অর্ধভুক্ত দেহের দিকে চেয়ে ভাবলাম, মাত্র বারো ঘণ্টা আগেও আমরা একত্রে ছিলাম। সে বীরদর্পে বলেছিল, বাঘকে কেয়ার করে না। আর তার কি পরিণাম। চোখ জলে ভরে এল। ফুর্তি করতে এসে এই অঘটন, যা সারা জীবনেও ভোলবার নয়।'

মিস্টার মজুমদার তাঁর কাহিনী থামালেন এখানে।

মে মাসের প্রচণ্ড গরম। সূর্যের প্রখর তেজে জ্বলে খা-খা করছে চারদিক। সাধারণত এপ্রিল শুরু হলেই শিকারীরা যে-যার বন্দুক-

রাইফেল তেল লাগিয়ে তুলে রাখে পরবর্তী শীতের মরসুমের জন্য। সুতরাং মে-তে কোনো কথাই উঠতে পারে না।

কিন্তু এই সময়েই এক বন্ধু এসে বলল, কৃষ্ণনগর থেকে কিছু দূরে

এক সরকারী জঙ্গলে বুনোশুয়োর মারবার অনুমতি পাওয়া গেছে—সঙ্গে যেতে হবে।

কৃষ্ণনগর? কলকাতাতেই এখন তাপমাত্রার অঙ্ক একশ আট-নয় ডিগ্রী উঠে গেছে। আমি একটু আপত্তি করে বললাম, 'কাজটা কি আরামের হবে এই গরমে?'

'শিকার কখনোই আরামপ্রদ নয়—' সে উত্তর দিল, 'সে শীতই হোক আর গ্রীষ্মই হোক।'

তার মানে আমার রাজী না হয়ে উপায় রইল না।

আপত্তি যখন টিঁকল না, মনকে বোঝাবার জন্য বন্ধুর কথাটাকে উপলব্ধি করতে চাইলাম। ভাবলাম, ঠিকই তো—শিকার করতে যাওয়া হাওয়া খাওয়া নয়। সুতরাং শীত, গ্রীষ্ম, রোদ, বর্ষা এ-সমস্ত মাথায় করেই মাভৈঃ বলে বেরিয়ে পড়তে হয়। শীতে যেমন রোদ্দুর বেশ মিষ্টি লাগে—গরমকালে জলে নেমে শিকার করা তেমনি আরামের। কিন্তু বিপরীত ঘটলেই দুর্ভোগের একশেষ। অথচ এসব প্রাকৃতিক বিধানকে এড়াবার উপায় কই? তবুও শিকার তো করতেই হবে।

বড় জানোয়ার শিকারের বেলায় অবশ্য গরম কালই বরং প্রশস্ত। এ সময় সব চেয়ে সুবিধে হল জঙ্গলটা পাতলা থাকে। অনেক জলাশয় শুকিয়ে শুধু নির্দিষ্ট ক'জায়গায় জল থাকে। গ্রীষ্মের নিদারুণ দাবদাহে জানোয়ারদের ঘন ঘন জলপানের জন্য ঐ সব জলাশয়ের কাছে যেতেই হয়। তাই সুবিধা মতো জলাশয় বেছে নিয়ে তার পাশে মাচা বেঁধে দুপুরের দিকে বসলেই শিকারের দেখা নির্ঘাত মিলবে। হরিণ, চিতা এমন কি বড় বাঘও পিপাসায় কাতর হয়ে শিকারীর রেঞ্জে এসে পড়বে। কিন্তু এ-ভাবে তৃষ্ণার্ত শিকারকে বাগে পেয়ে মারা অনেকেরই নীতি-বিরুদ্ধ। আমি নিজেই পারি না—কেমন বিবেকে বাধে।

যাই হোক একদিন ভোর চারটের সময়, অনুমেয় রৌদ্রজ্বালার কষ্টকে উপেক্ষা করে কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। কৃষ্ণনগরে থেকে প্রাতরাশ সেরে সোজা জঙ্গলের পথ ধরলাম।

বেলা আটটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম সেখানে। ফরেস্ট গার্ড হাজির ছিল। তাকে অনুমতিপত্র দেখিয়ে এবং সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আমরা জঙ্গলটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। নানারকম কথা হল চলতে-চলতে। ফরেস্ট গার্ড বলল, 'এমনি শুয়োর এখানে প্রচুর পাবেন—তাছাড়া কয়েকটি বড় দাঁতালো শুয়োরও আছে।'

চুলের সিঁথির মতো মাঝামাঝি জঙ্গলটাকে দ্বিধাবিভক্ত করে একটা মেঠো রাস্তা বরাবর চলে গেছে। রাস্তা ধরে আমরা হাঁটছি হাঁটছি। কিছু দূর গিয়ে বন্ধুটি হঠাৎ কি ভেবে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

একটু পরেই বন্দুকের আওয়াজ কানে এল। শূন্যতায় কিছু তরঙ্গ তুলে শব্দটা মিলিয়ে গেল। আমরা শব্দ লক্ষ্য করে গিয়ে দেখি শুকনো একটা ডোবার মধ্যে মাঝারি সাইজের একটা শুয়োর পড়ে রয়েছে। বন্ধু তো খুব খুশি, যাত্রা শুভ হল তাহলে।

ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল সেদিন হাঁকোয়ার কোণে। সুবিধে হবে না। কারণ হাঁকোয়ার লোকেরা আগে খবর না থাকায় অন্য কাজে চলে গেছে। দিন শেষে ফিরবে। সে কথা দিল যে পরের দিন সকালে হাঁকোয়ার লোকজন জোগাড় করে রাখবে।

তখনকার মতো ফেরা গেল। আমরা সরকারী বাংলোয় আশ্রয় নিলাম। চারিদিক অসম্ভব গরমে উতপ্ত হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে কৃষ্ণনগরের তাপমাত্রা তখন একশ তের-চোদ্দ ডিগ্রী উঠেছিল। চারিদিক খা খা করছে। সূর্য যেন রেগে জ্বলছে রক্তবর্ণ হয়ে। ঘরের

মধ্যেও বসেও মনে হচ্ছিল একটা জ্বলন্ত ফারনেসের মধ্যে বসে আছি। রোদে তেতে তপ্ত হয়ে আছে সব কিছু। হাঁস-ফাঁস করে কোনো রকমে তুপুরটা কাটিয়ে দেওয়া গেল। এক কাপ করে চা খেয়ে তিনটে নাগাদ আবার জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। শিকার হোক না হোক, মনে মনে ভাবলাম জঙ্গলে অন্তত কিছুটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যাবে।

জঙ্গলে পেঁাছে সেই মেঠো রাস্তাটাকে শিকার ক্ষেত্রের সীমানা ঠিক করে আমরা তু'জনে তু'দিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। কারণ তু'জনে একই জঙ্গলে এসে পড়লে যে কোনো একটা বিপদ হতে পারে।

জানোয়ারদের চলবার সরু পথ অনুসরণ করতে করতে ক্রমে বৃক্ষ-পত্রাদির ছায়ার নিচে প্রবেশ করে উষ্ণতা বোধ খানিকটা কমল, কিন্তু ভীষণভাবে ঘামতে শুরু করলাম। কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে চশমার কাচ ঝাপসা করে তুলল—কাচ তু'টোকে তখন বৃষ্টির সময় ওয়াইপারহীন মোটরগাড়ির উইণ্ড-শীল্ডের মতো দেখাচ্ছে। থেকে থেকে রুমাল বের করে কাচ মুছছি আর এগোচ্ছি। জঙ্গলের গভীরতার এক অনাস্বাদিত গন্ধ নাকে। চারদিক থেকেই বুনো গন্ধটা নেশার মতো ঘিরে ধরল। কোনো সাড়া শব্দ নেই। নিস্তব্ধ অবাক, হয়ে প্রভৃতি এই প্রচণ্ড তুপুরে আলসেমিতে বিশ্রামে নিমগ্ন। এক জায়গায় এসে রাইফেলটা বগলে ধরে চশমাটা রুমাল দিয়ে পুঁছছি—এমন সময় হঠাৎ একটা ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ করে শব্দ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি চশমা চোখে দিয়ে তাকাতেই দেখি দশ-পনের গজ দূরে একটা শুয়োর বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলাম। শুয়োরটা বোকা নেহাৎ, রাইফেলটা তুলতেই সে পেছন ফিরে পালাতে চেষ্টা করল। অথচ

সে যদি সমান বেগে দৌড়ে আসত তবে আমি প্রস্তুত হবার আগেই আমাকে কাৎ করতে পারত। সমস্তটা ঘটতে মাত্র তিন-চার সেকেণ্ড সময় নিল—একটা শিরশির উত্তেজনা। আমি কিন্তু ঐটুকু সময়কেও অপব্যবহার করলাম না। ফায়ার করলাম সঙ্গে সঙ্গে। বন্দুকের শব্দটা শূন্যতা ভেদ করে গড়ালো। একটু আগের নিস্তব্ধতা ভেদ করে রাইফেলের শব্দে নিথর অরণ্য যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। গুলি শুয়োরের পাঁজরা ভেদ করে ঢুকে গেল—চোখের পলকে জানোয়ারটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম রাইফেলের বিশ্বস্ততায়।

সেদিনকার মতো শিকার শেষ হল। সন্ধ্যা নাগাদ কৃষ্ণনগরে ফিরে এলাম। দু'টো শুয়োর মারা পড়েছিল। সেগুলো কাটিয়ে বরফের বাক্সে রাখার বন্দোবস্ত করে বাংলোয় ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা বাজল। খাওয়া দাওয়ার পালা চুকিয়ে সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু গরমে ঘুম এল না। মাঝ রাত পর্যন্ত ছটফট করে শেষ পর্যন্ত বাংলোর সামনের মাঠে বসে বাকী রাতটা নির্ঘুম কাটল।

আকাশ ফরসা হয়ে ভোরের আলো ফুটতে প্রাতরাশ সেরেই আবার সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। আজ যে করেই হোক একটা অন্তত দাঁতালো শুয়োর মারতে হবে। আশা নিয়ে জঙ্গলে এসে পৌঁছে সব বন্দোবস্ত শেষ করে নিলাম। আটটা নাগাদ হাঁকোয়ার দল এসে পৌঁছুল। সূর্য তখন অনেকটা উঠে গেছে। রোদ কড়া হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই। প্রথমে জঙ্গলের একটা কোণ বেছে নিয়ে ছোট রকমের হাঁকোয়া হল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। এরপর বড় জঙ্গলে হাঁকোয়ার পালা। এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে শুয়োর যাতায়াতের দু'টো পথের পাশে বেশ খানিকটা ব্যবধান বজায় রেখে

আমরা ছ'জনে দাঁড়ালাম। আমার পাশেই একটা ঝোপ। ঝোপের মধ্যে যতটা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছি। চোখ খোলা সামনে। বেলা দশটা তখন। উজ্জ্বল রোদ্দুর তখন ঝলসাচ্ছে জঙ্গলে গাছের মাথায় মাথায়। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে অরণ্য, বহ্নিজ্বালায় তেতে উঠেছে সব কিছু। রাইফেলের নলটাও তেতে আগুন--এত গরম যে তার গায়ে হাত রাখাই মুশকিল।

বাঁশি বাজাতেই হাঁকোয়া শুরু হল। হা-রে-রে-রে চিৎকার করে হাঁকোয়ার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করছে, ছ'টো বাঘা দেশী কুকুর। এক একবার চিৎকার কম হয়ে এসে আবার সারা বন কাঁপিয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। জঙ্গলময় একটা উত্তেজনার ঢেউ প্রবাহিত হল। উত্তেজনার সঙ্গে কেমন এক বুক কাঁপানো অনুভূতি ঘিরে ধরল এসে।

ঝোপের পাশেই দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামনে শিকারের অপেক্ষায় খোলা। হঠাৎ সরসর একটা শব্দ হল পাতার উপর। একটা শিয়াল দেখলাম কিছু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে। আবার হাঁকোয়ার শব্দ উঠতেই সে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে হারিয়ে গেল।

এবার হাঁকোয়াদের হল্লা আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ভীষণ জোরে শুরু হল। মনে হল আশার ব্যাপার। প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম। পুরোপুরি অ্যাটেনশন। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে একাধিক জানোয়ার চলার শব্দ শুনতে পেলাম। দেখলাম তিনটে শুয়োর এক সঙ্গে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে আসছে। শেষেরটা বিরাট দাঁতালো, অন্য ছ'টো তেমন বড় নয়। দাঁতালোটাই আকর্ষণীয়। আমার চোখ টেনে নিল লক্ষ্য স্থির করে আমি গুলি ছুঁড়লাম। শুয়োরটা ছুটছিল তাই গুলি ঠিক বুকে না লেগে পেটে গিয়ে লাগল। ফল হল সাংঘাতিক।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে সে ছুটে আসতে লাগল আমার দিকে। এদিকে সমূহ বিপদ। রাইফেলে গুলি ভরতে গিয়ে দেখি বোল্টটা কিছুতেই খুলছে না—সূর্যের তেজ আর তার ওপর ফায়ারিং-এর তাপ পেয়ে পেতলের খোলটা বেড়ে চেম্বারের গায়ে আটকে গেছে। পিছু হঠব —তারও উপায় নেই। লতানে কাঁটার ঝোপে জামা আটকে রয়েছে। একটা চরম বিপদের সম্মুখীন হওয়ায় সমস্ত বুদ্ধি লোপ পাচ্ছিল। পালানোর রাস্তা বন্ধ। রাইফেলের বোল্টটা আর একবার খোলবার চেষ্টায় বৃথা টানাটানি করলাম। শুয়োরটা মাত্র হাত দশেক দূরে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে আট দশ সেকেণ্ডের বেশি লাগে নি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর কামড়ের জন্য প্রস্তুত আমি। এটুকু সময়ে সমস্ত চেতনাই লোপ পেয়েছে—নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি ওর আক্রমণের হাতে। রাইফেলটাকে বাগিয়ে লাঠির মতো যে ব্যবহার করব তাও মাথায় আসে নি। শুধু ভীষণ একটা কিছু ঘটে যাওয়ার অপেক্ষায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর একটু···আর একটু···শুয়োরটা এসে পড়েছে—এইবার, হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা উল্টে গেল। সামান্য তফাতে এসেই আহত শুয়োর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল আর অসহায়ের মতো পা ছুঁড়তে লাগল।

এই ব্যাপারে আমার চেতনা আয়ত্বে ফিরে এল। আত্মরক্ষার বুদ্ধি মাথায় আসতেই রাইফেলের বোল্টে আর একবার টান লাগালাম। জোর দিতেই এবার বোল্টটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর এক গুলিতেই শুয়োরটার ভবলীলা সাঙ্গ করলাম। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে মনে হল যেন আমার পুনর্জন্ম হল।

এদিকে খেয়াল ছিল না কাঁটায় এমন জড়িয়ে গেছি যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না। আমি একটু নার্ভাসও হয়ে গেছি। যেন কোনো

নাগাদ একটা ট্রাকে করে ঘণ্টা দুই অরণ্যভেদী রাস্তা ধরে বাংলোয় পৌঁছলাম।

ট্রাকে যাওয়ার সময় ড্রাইভার বলল, 'সাবধানে থাকবেন, আর অন্তত একটা বন্দুক খাপ থেকে বার করে রাখুন।'

কথা মতো বন্দুক হাতে বসেছিলাম—যদিও তা কোনো কাজে আসে নি।

সে রাত কাটল। পরদিন সকালের আলোয় জায়গাটা দেখলাম। চারপাশ দেখে মনে হল বিংশ শতাব্দী থেকে অনেক পেছনে সরে যেন কোন অতীতে চলে গেছি। ডাকবাংলোর কিছু দূরেই একটি ক্ষুদ্র বস্তী, ঘর পঁচিশ বাসিন্দা। বাংলোর পাশে দু'-তিনটে ঘর খানসামা আর ফরেস্ট গার্ডের। মানুষ বলতে এই। এদের দেখে কেমন একটা চিন্তা মনে দানা বাঁধত। এরা সভ্যতার অগ্রগতির কোনো খোঁজই কি পায় নি? না, এরা উচ্চাভিলাষ বঞ্চিত একদল অকর্মণ্য অরণ্যচারী মানুষ। যাদের জন্ম মৃত্যু এখানেই। নিম্নস্তরের উৎপন্ন স্থানীয় আহার্যই প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। ট্রেন চলে এটা এদের কাছে শোনা-কথা। দু'-চারজন মাত্র চাক্ষুষ দেখেছে। লছমন নামে একটি ছোকরার কাছে শুনলাম সে কলকাতা দেখেছে। সেইজন্য খাতিরও তার তেমনি। আজব শহর কলকাতার গল্প সে যখন বলে সবাই হাঁ হয়ে শোনে। অনেকে অনেক কথা বিশ্বাসই করে না। দু'-একজন তো আমাকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিল ওর কথা সত্যি কিনা।

একজন বলল, 'সাহেব, কলকাতায় বলে রাস্তার দু'পাশে সার সার উঁচু বাড়ি আছে?'

আর একজন জানতে চাইল, 'গাড়ির ভিড়ে কলকাতার রাস্তা নাকি পার হওয়া যায় না ?'

ভাগ্যিস লছমন রেডিও টেলিফোন এ-সব তেমন খুঁটিয়ে দেখে নি। সে-সব গিয়ে গল্প করলে ওকে পাগল বলেই হয়তো দেশছাড়া করত।

আমরা এসেছি শুনে বস্তীর মোড়ল দেখা করতে এল। সঙ্গে একটি লোক, নাম যোকন। আমরা চেয়ারে বসেছিলাম। তাকে চেয়ারে বসতে বললাম। মোড়ল কিছুতেই বসবে না। জোর করে তাকে বসানো হল। যোখন বসল মাটিতেই। চায়ের হুকুম দিল'ম। চা এল। চা আসতে তো মোড়ল আরো অপ্রস্তুত। যোখন সামনে কিছুতেই চা নিল না। উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানে আড়ালে চা খাবে।

মোড়লের সঙ্গে শিকারের গল্প হল। মোড়ল বলল, 'বাঘ রয়েছে এখানে, একদিন হাঁকোয়া লাগিয়ে দিন, শিকার পেয়ে যাবেন।'

ব্যক্তিগত ভাবে এ-ধরনের শিকার আমার অপছন্দ। জঙ্গলে বাঘ আছে জেনেও নিরীহ দরিদ্র মানুষকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে হাঁকোয়ার ব্যবস্থা করে নিজে নিরাপদ মাচায় রাইফেল নিয়ে বসে থাকা—বা গরু মোষ বেঁধে বাঘকে প্রলোভন দেখানো—এ-রকম আমি করি নি। মোড়লের কথার উত্তরে তাই বললাম, 'ও-সব কিছু নয় স্রেফ পায়ে হেঁটে ঘুরব। তাতে শিকার যদি পাই তো ভাল। আর কিছু করার দরকার নেই।'

'বলছেন কি ?' মোড়ল কথা শুনে, অবাক তো। আমরা নয় পায়ে হেঁটে রাত-বি-রেতেও জঙ্গলে ঘুরি, তা বলে আপনারা পারবেন কেন ?'

'তা পারব ঠিক।' মোড়লকে ভরসা দিয়ে বললাম।

একদিন দুপুরে মোড়লের কথা মতো আমরা শিকারের জন্য একটা স্থান দেখতে গেলাম। স্থানটি অদ্ভুত। বস্তীটার তিন দিকে দূরে পাঁচিলের মতো পাহাড়ের সীমানা। মাইল তিনেক হেঁটে আমরা একটা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মোড়ল জানালো, 'অন্য রাস্তা থাকা সত্ত্বেও এই সুড়ঙ্গপথে জানোয়াররা ক্ষেতে চরতে আসে—তাদের পেছনে বাঘও এসে পড়ে। যে কোনো দিন সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত বা শেষ রাত্রে এসে বসলেই বাঘ দেখা যাবে।' চারপাশ দেখে সুড়ঙ্গের পেছনে পাহাড়ে উঠলাম। সমস্ত জায়গাটা ঘিরে অরণ্য। কোনো কোনো স্থানে এত ঘন বন যে সূর্যের আলো পর্যন্ত প্রবেশ করে না। আলো না লাগায় শিশির পড়ে নিচের জমি জলাভূমির মতো প্যাচপ্যাচে হয়ে গেছে। গাছে গাছে কিছু বানর আর নানাজাতের পাখির ভিড়। লতাপাতায় আচ্ছন্ন সর্বত্র। কোনো লতা গাছ থেকে ঝুলছে মাটির দিকে, আবার মাটি থেকে গাছ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বহু লতা উঠেছে ওপরের দিকে।

পাহাড়ের ওপরে চুড়োয় উঠে দেখলাম আমরা ঢালু দিকটা দিয়ে উঠেছি। অপর দিকটা খাড়া নেমে গেছে। যেন একটা মাটির ঢিপিকে কেউ মাঝখান থেকে কেটে দিয়েছে। এতক্ষণে সুড়ঙ্গ দিয়ে পশুদের যাতায়াতের কারণটা কিছু বোধগম্য হল।

পাহাড়ের ওপর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তার সামনে সোজা খাড়াই। পেছনে ঢালু দিকটা শেষ হবার পর কিছুটা সমতলভূমি —তারপর গ্রামের শুরু। খাড়াই দিকটার সামনে সম্পূর্ণ জঙ্গল। আদিগন্ত জঙ্গল আর জঙ্গল। দেখলে মনে হয় পৃথিবীর মানব সভ্যতা আর এদিকে বিস্তার লাভ করে নি। মোড়ল বলল, 'সব জানোয়ার দিনে ওই জঙ্গলে থাকে—যাতায়াতের অসুবিধে আর মৌমাছির

ভয়ে ওদিকে কোনো মানুষ যায়ই না, বিলকুল জানোয়ারের রাজত্ব। দূরে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের দিকে নির্দেশ করে বলল, 'ওদিকটা নেতারহাট।'

'এখান থেকে নেতারহাট যাবার সোজা রাস্তা আছে কি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মোড়ল আমার প্রশ্নে বিস্মিত হল। 'জঙ্গলে কেউ ঢুকতেই পারে নি তো রাস্তা তৈরী হবে কি করে?'

বুঝলাম জঙ্গলে কোনো মানুষের পা এখনো পড়ে নি।

বেড়িয়ে ফিরে এসে ঠিক করলাম, সুড়ঙ্গপথে জানোয়ার যদি এদিকে আসে তবে শেষ রাতে গিয়ে বসাই লাভজনক। তাই স্থির হল। পরদিন রাত তিনটে নাগাদ রওনা হলাম। সঙ্গে ফরেস্ট গার্ড। সেই টর্চ হাতে পথপ্রদর্শক। এ-ছাড়া মোড়ল ও আর একজন শিকারী।

মোড়ল যেতে যেতে বলল, 'স্থানটা খুব নিরাপদ নয়—দু'জনই আপনারা এক জায়গায় থাকবেন।' সুড়ঙ্গর কিছু আগে থেকেই মাঠ শেষ হয়ে ঝোপ শুরু হল। আবছা জ্যোৎস্নার আলোতেই এতক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটে আসছিলাম, ঝোপ শুরু হওয়াতে ফরেস্ট গার্ড ফ্লাশ লাইটটা জেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক করে ভীষণ এক শব্দের সঙ্গে ঝোপটা দুলে উঠল। গার্ড এক লাফে দশ হাত পেছিয়ে গেল—রাইফেল প্রস্তুত করে সেদিকে আমি আবার আলো ফেলতে দেখলাম কিছু নেই।

অনুমান করলাম অন্ধকারে আমাদের মতো ইনিও এসে শিকারের অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ জোর আলো দেখে ঘাবড়ে গেছেন।

ইতিমধ্যে দূরে একটা সম্বরের ডাক শোনা গেল। সেই শব্দ শুনে বললাম, 'সুড়ঙ্গের কাছে চল।'

যাতে না বিপদ হয় তার জন্য দু'জন করে লাইনে রাইফেল রাগিয়ে এগোলাম। মনে মনে আশা এবার বাঘ বা সম্বর যে কোনো একজনকে সুড়ঙ্গ পথে আসতে হবে।

যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমরা সুড়ঙ্গের মুখে এসে পৌঁছে দশ বারো গজ দূরে এক একটা গাছের আড়ালে বসে পড়লাম। আমাদের পেছনে ও সামনে শাল আর লতানো ঝোপে ভর্তি পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমশ উঁচু হয়ে উপরের দিকে উঠেছে। বসবার জায়গাটা উপত্যকার মতো। সম্বরটা দূরে তখনো একটানা ডাকছে। রাইফেল হাতে আমরাও প্রস্তুত হয়ে শব্দ অভিমুখে তাক করে বসে আছি। যে কোনো মুহূর্তেই সম্বর আসতে পারে। ক্রমশ উষার আলো একটু একটু করে ফুটে উঠেছে! হঠাৎ আমার পেছনে কি রকম যেন একটা অনুভূতি, পেছনে তাকাতেই পাহাড়ের ঢালুর ওপর দিকটার একটা ঝোপ নড়ে উঠল। আবছা আলোয় দৃষ্টিগ্রাহ্য কিছু না দেখা গেলেও চোখকে একেবারে অবিশ্বাস করা গেল না। বন্ধু শিকারীকে সম্বরের দিকটা নজর রাখতে বলে যে গাছের আড়ালে আমি বসেছিলাম, পেছন ফিরে তাতে ঠেস দিয়ে সামনের সন্দেহযুক্ত ঝোপটার দিকে মুখ করে বসলাম। কপাল খুবই খারাপ—শেষ পর্যন্ত সূর্য উঠল, কোনো জানোয়ার এল না।

সকাল সাড়ে ছ'টায় সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ থেকে উঠে পড়লাম। খুব ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে এ-বার সেই ঝোপটার পাশে গেলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম—ঝোপের নিচে কাঁকড় মেশানো মাটিতে বাঘের পায়ের টাটকা স্পষ্ট ছাপ। মোড়লকে ডেকে

বললাম সব। তারপর সেই চিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। পাথুরে জায়গায় পায়ের দাগ কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট—কোথাও বা নেই-ই। তবু আন্দাজে আমরা চলেছি। অবশেষে একটা নরম ঘাস পরিবৃত জায়গায় এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, বেড়াল যেমন মাঝে মাঝে সামনের থাবা দিয়ে কিছু আঁচড়ায় বাঘটাও এখানে তেমনি করে নখ দিয়ে ঘাস ছিঁড়েছে। মোড়ল আর গার্ড তাই দেখে বলল, 'বাস্‌রে বাঘের এত গোসা হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস্‌ আমাদের কিছু বলে নি।'

আমি তখন অন্য কথা ভাবছি। বিপদে মানুষের অবচেতন মন কি ভাবে কাজ করে সে কথা জিম করবেটের বইতে পড়েছি। আজ নিজেই সেই অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। অনুভব করলাম বাঘটা শিকারের জন্য ঝোপের মুখেই অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ জোরালো আলোয় ভয় পেয়েছিল। তারপর আমাদের একজনকে বা সেই সম্বরের উদ্দেশ্যে এই ঝোপের কাছে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার সচেতনতায় তাতেও বিফল হয়ে রেগে এখানে বসে ঘাস ছিঁড়েছে। যেন তার চিহ্ন রেখে বোঝাতে চেয়েছে, আর যেন এ রকম ধৃষ্টতা আমাদের না হয়।

সময় মতো আমার বোধ অনুভূতিতে কাজ না করলে সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে পারত—তাই ভাবছিলাম। বাঘ একবার কাউকে ধরে কোনো রকমে সুড়ঙ্গ পার হতে পারলে তারপরেই ঘন বিস্তীর্ণ জঙ্গল—যেখানে হাজার বন্দুক থাকলেও বাঘে ধরা মানুষের মৃতদেহটাও আর উদ্ধার করা যেত কিনা সন্দেহ।

'বাঘ'? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি, এই দিনে দুপুরে গ্রামের মধ্যে বাঘ কি করতে আসবে?'

'লোকটা তো তাই বলে গেল—' দাদা উত্তর দিলেন, 'বাঘটা ছাগল

প্রথম চিতা

শিকার কাহিনী

ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সবাই সে-সময় দেখতে পেয়েছে। তুই একবার বন্দুকটা নিয়ে ঘুরেই আয় না।'

অনেকদিন আগের ঘটনা এটা। একবার সপ্তাহান্তে গ্রামের বাড়িতে যখন গিয়েছিলাম সে-সময় ঘটে। নিজস্ব বন্দুকের লাইসেন্স তখন সবে পেয়েছি—বন্দুক কেনা হয়ে ওঠে নি। বাড়ির বন্দুকটা আর দু'টো এল. জি. আর দু'টো বুলেট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে মনে ধরেই নিয়েছিলাম, খবরটা গুজব মাত্র—ও-সব বাঘ সিংহ কিছুই নয়, তাই দাদা নিজে না গিয়ে আমাকে পাঠালেন। তবুও এই সুযোগে দায়িত্বটা কাঁধে চাপায় খানিকটা গর্বের আনন্দ বোধ করলাম।

গ্রামের বাঘ, তার উপর তিনি এসে গেছেন—সুতরাং শিকারীর সাজ-পোশাকের সময় বা প্রয়োজন কোনোটাই নেই। নিজের পোশাকটা এখনো মনে পড়ে, পরনে কোমর বাঁধা ধুতি—গায়ে হাতা গোটানো শার্ট পায়ে চটি। ঠিক যেন রকে আড্ডা মারতে যাচ্ছি এই ভাব! ভাবলাম—গিয়ে দেখব তো বড় জোর শিয়াল।

বাঘ দেখা গেছে গ্রামের প্রান্তে, স্থানটা কিঞ্চিৎ জঙ্গলাকীর্ণ। সেখানে পৌঁছনোর পর সমস্ত দেখে-শুনে মনে হল খবরটা একেবারে ভুয়ো নয়—মনে আশা জাগল। লোকের মুখে ঘটনাটা পুরো শুনলাম, একটি অন্তঃস্বত্বা ছাগীর ঘাড় কামড়ে ধরে বাঘ যখন ছ'ফুট উঁচু পাঁচিলের উপর লাফ দিয়ে উঠেছে তখন অনেকে দেখতে পেয়ে 'বাঘ-বাঘ' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। চিৎকার শুনে বাঘ ছাগীকে ফেলে দিয়ে এক লাফে পাঁচিলের পেছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। বহু লোক সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলটা ঘিরে রেখেছে। সকলের দৃঢ় ধারণা বাঘ বেরিয়ে পালাতে পারে নি, এখনো জঙ্গলের ভেতর রয়েছে। ছাগীটার মালিক তার শুশ্রূষা করছেন। কাছে গিয়ে দেখলাম, ছাগীর ঘাড় ভেঙে গেছে, গভীর ক'টা ক্ষতস্থান দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে

সকলের মুখ থেকে বাঘের যে আকার জানলাম তাতে অনুমান করলাম এল. জির বেশি বড় গুলির দরকার হবে না। সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জঙ্গলের কাছে গেলাম। প্রত্যক্ষদর্শীরা যেন নেতার ভূমিকা নিয়েছে। বাধ্য হয়ে আমি তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি এ রকম ভাব দেখিয়ে বললাম, 'জঙ্গলের ধার থেকে সবাইকে সরিয়ে দিন আর সরিয়ে দিন বন্দুকঅলা ওই ভদ্রলোককেও।' খবর পেয়ে বন্দুক নিয়ে কখন তিনি আমার শিকারে ভাগ বসাতে চলে এসেছেন।

বন্দুকে গুলি ভরে পাঁচিলের উপর উঠে আমি জঙ্গলটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। সমস্তটা নিয়ে বিঘে দুই হবে। এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিটানো কিছু তাল আর খেজুর গাছের নিচে নিচে ঝোপ, মাঝখানটা ফাঁকা। বাকীটা পাটগাছের মতো একরকম বুনো গাছের ঠাসা জঙ্গল। গাছগুলোর গোড়ার কাছে আঙুলের মতো মোটা—দেড় দু'ফুটের মধ্যে কোনো ডালপাতা নেই—তারপর সামান্য পাতার চিহ্ন, ওপরের দিকটা ডালপাতায় ভরে গেছে। পাঁচিলের ওপর থেকে ঘন ঝোপ ভেদ করে তেমন কিছু দেখা গেল না। বাধ্য হয়ে পাঁচিল থেকে নেমে বন্দুক উঁচিয়ে ছড়ানো প্রত্যেকটা ঝোপের এক একটা করে দেখতে শুরু করলাম। ওর মধ্যে একটু বড় একটা ঝোপের ভেতর জানোয়ারদের চলাচলের সরু পথ। খুব সাবধানে প্রায় পা টিপে টিপে সেই পথের মুখের কাছে এসে ভেতরে তাকাতেই সাদা মতোন কি যেন একটা চোখে পড়ল। আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর মনে হল সাদাটে রঙটা ক্রমশ হলদে হয়েছে এবং তার উপর রয়েছে কালো কালো ফোঁটা। এবার স্পষ্ট বোঝা গেল ওটা চিতা বাঘের পেট। জঙ্গলের ভেতর দিকে মুখ করে বাঘটা শুয়ে। তাই আমার আগমন ওর লক্ষ্যে

পড়ে নি। তার পেটের ওঠানামার দ্রুততা দেখে মনে হল বেশ ভয় পেয়েছে সে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে যে দিকে গুলি ছুঁড়ব সে দিক থেকে সব লোক হঠালাম প্রথমে। সব সময় ভয়—উত্তেজনার মাথায় লোকই না খুন করে বসি, এই ধারণা মনে গেড়ে বসায় গ্রামের লোকদের গতিবিধির উপর আমার কড়া নজর ছিল।

বাইরে ব্যবস্থা সেরে আবার ফিরে এলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। ঝোপের পথটুকুর ভেতর দিকে চিতাটা তেমনই রয়েছে। আমাদের মধ্যে ব্যবধান মাত্র আট-দশ গজ। বড় জাতের জানোয়ার মারতে হলে 'ভাইটাল' পার্টে গুলি চালাতে হয়; অর্থাৎ মাথা বা বুক প্রয়োজন। কানের ফুটো বা চোখের কোণে গুলি বসাতে পারলেও জানোয়াররা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এখান থেকে পেট ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত বিবেচনা করে ভাবলাম ওপর পেটটার যে ইঞ্চি ছয়েক দেখতে পাচ্ছি তার ওপর এল. জির গোটা পাঁচেক গুলি বসিয়ে দিতে পারলেই আমার কাজ ফতে। যদিও বেশ কিছুটা বিপদের ঝুঁকি আছে এতে—তবু মনস্থির করে হাঁটু গেড়ে বসে লক্ষ্য স্থির করার পর গুলি ছুঁড়লাম।

বাইরে থেকে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, বাঘ পালাচ্ছে। চিৎকার শুনে পলায়মান বাঘের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু বাঘ আর পালাতে পারল না। গুলি ছোঁড়বার পর এক লাফে জঙ্গল পেরিয়ে যেখানে এসে পড়েছিল সেখানেই সে নিথর হল। কাছে গিয়ে দেখলাম বন্দুকের গুলি লেগে পেট ফুটো হয়ে চিতার প্লীহাটা বেরিয়ে ঝুলছে। এই আমার প্রথম চারপেয়ে জন্তু শিকার। বিশেষ করে প্রথমটাই চিতা। সেদিনের আমার উল্লাস অবর্ণনীয়। কথাটা এখনো ভাবলে গর্বে বুক ফুলে ওঠে।

লতেহার স্টেশন থেকে আঠারো-বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সরজুর জঙ্গল। সেখানে থাকাকালীন একদিন বিকেলে কিছু খাবার পাখি মারবার জন্য বেরোলাম। আমার হাতে পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটা।

সৌন্দর্য শিকার

শিকার কাহিনী

পাখি মারবার জন্য শটগান ছুঁড়লে অন্য জানোয়াররা আর সেই শব্দে জঙ্গলের ত্রিসীমানায় থাকে না। সেই কারণে বড় রকমের শিকার

করতে গেলেও খাবার পাখি মারবার জন্য পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটা সব সময় সঙ্গে থাকে। এতে শব্দ বেশি হয় না—সুতরাং অন্য শিকার হাতছাড়া হবার ভয় থাকে না।

বিকেল তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফরেস্ট গার্ড আর আমি দু'জনে যাচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে বাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছি। সামনের দিকে আর কিছুটা গেলেই একটা খাদ পড়বে—খাদের পর থেকে শুরু হয়েছে পাহাড় আর জঙ্গলের সীমারেখা। এদিকেও খাদের গা ছুঁয়ে এক সারি ঝোপ আর জঙ্গল। পশ্চিম আকাশে ক্লান্ত সূর্যদেব যাই যাই করছেন। তার নরম আভা মেখে সমস্ত গাছপালা নিথর। আদিগন্ত শূন্যতায় অদ্ভুত এক অরণ্যের মায়াবী আঁচল বিছানো। বাতাসে অদ্ভুত এক আমেজ।

খাদ থেকে হাত তিরিশেক দূরে আমাদের দিকে ছোট একটু ঝোপ মতন। তার ভেতর আকাশের দিকে ঋজু শরীর তুলে প্রহরীর মতো দাঁড়ানো গোটা তিন-চার বিশাল গাছ।

ডালে আর ঝোপ দেখতে দেখতে বসেছি। এ-পর্যন্ত তেমন কথা হয় নি। দু'জনেই প্রায় নীরবে পথ হেঁটেছি।

ঝোপটার নিকটবর্তী হতেই ফরেস্ট গার্ড বলল, 'ওই বড় গাছগুলোর কোনো একটার মাথায় হরিয়াল ডাকছে।'

ওর কথা সত্যিই। আমার কানে সেই শব্দ ভেসে এল। তাড়াতাড়ি শব্দ লক্ষ্য করে আন্দাজে একটা ঝোপের কাছে এসে ঝোপটাকে ডান পাশে রেখে একটা বড় গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার দৃষ্টি এতক্ষণ গাছের ডগায় নির্দিষ্ট ছিল। পায়ে ছিল হান্টিং কেডস্। পা টিপে টিপে চলে এসেছি। কোনো শব্দ হয় নি সে জন্য। ওই গাছটার অবস্থান একেবারে কোণের দিকে, যেখানে ঝোপটা শেষ

হয়েছে। যার কয়েক হাত বাদেই খাদের এদিকের ঝোপের শুরু।

গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে হরিয়ালটা কোথায় লক্ষ্য করছিলাম। নিচের দিকে আমার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ চোখ দু'টো নামিয়ে তাকাতেই দেখলাম খাদের ঝোপটার পাশে একটা চিতাবাঘ নির্লিপ্ত প্রশান্তিতে শুয়ে বেলাশেষের রোদ পোহাচ্ছে।

শীতকালে বনের সব পশুরাই বেরিয়ে এসে সকালে রোদ পুইয়ে আবার জঙ্গলের গভীরে আশ্রয় নেয়। পুনরায় বিকেলে অস্তগামী সূর্যের শেষ তাপ নিতে বেরিয়ে আসে। আমেজে শরীর তাজা করে নির্জনে।

এ-রকম অল্প দূরে এমন অজান্তে ও প্রস্তুতহীন অবস্থায় আমাদের মধ্যে দেখা হয়ে যাবে তা একবারও ভাবতে পারি নি। আমার হাতে পয়েণ্ট টু-টু; যা দিয়ে এই আসন্ন মোলাকাৎকে অভ্যর্থনা করা যায় না, এবং এ-রকম বিপদে নিস্তারের আশাও করা সম্ভব নয়, উল্টে এর গুলিতে চিতা আহত হলে বিপদের সম্ভাবনা আরো বেশি। তাই খানিকটা বাধ্য হয়ে এ-রকম বিপদের হঠাৎ আগমনের বিহ্বলতায় পাথরের মতোন সেই বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম। হরিয়ালের চিন্তা তখন মন থেকে মুছে সাফ হয়ে গেছে।

চিতাও বোধ হয় আমাকে দেখতে পেয়েছিল। আমার বিহ্বলতা করুণ হয়ে হয়তো ওর চোখে ছায়া রচনা করেছিল। সে বেশ রাজকীয় গুরুগম্ভীর চালে উঠে পড়ল। তারপর হেলতে দুলতে আস্তে আস্তে ঝোপের মধ্য দিয়ে খাদের দিকে নেমে গেল।

আমার দিকে এল না, বা আমাকে আক্রমণ করবার কোনো ইচ্ছাই

তার ভাবভঙ্গিতে ফুটল না। যেন উপেক্ষা করে চলে গেল। আমি তখনোও ঠায় দাঁড়িয়ে। কেমন যেন উপলব্ধিশূন্য চেতনাহীন অবশ হয়ে গেছি।

ইতিমধ্যে ফরেস্ট গার্ড এসে উপস্থিত। তাকে দেখে আমার খানিকটা সাহস বাড়ল। সাড় ফিরে এল।

সে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে?'

আদ্যোপান্ত ঘটনাটা খুলে বললাম।

উত্তরে সে বলল, 'সাব নসিবকা ফেরমে বাঁচ গিয়া আপ।'

ওর কথা ঠিকই। আমার অবস্থাটা যদিও খুবই বিপজ্জনক ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু যে অপূর্ব দৃশ্য দেখেছি তা অবর্ণনীয়। প্রশান্তির সঙ্গে শক্তির মাঝে সুন্দরের এই নির্লিপ্ত ভঙ্গি স্মৃতির স্মরণীতে আজীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

চিতার কাঁচা হলুদ রঙের পর সূর্যের সোনালী আলোর প্রলেপ অরণ্যের একান্তে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় সুষমার রচনা করেছিল। মৃত্যুভয় ভুলে আমি বর্ণ সমারোহে ডুবে গিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে চিতার নির্ভীক বলদর্পী আচরণ—ঝোপের অন্তরালবর্তী বিলীয়মান তার শরীরের সৌষ্ঠব, আভূমিলুণ্ঠিত লাঙুল—শক্তির ইঙ্গিতবাহী সুগঠিত পেশী, নিটোল পশ্চাৎভাগের গড়ন ও সঞ্চালনের সঙ্গে বিকেলের মরণোন্মুখ রোদের হলুদাভা যে দৃশ্যপটের উপস্থাপনা করেছিল তা তুলনাহীন। মুগ্ধ হয়ে আমি যে ভাবে তা উপভোগ করেছি সে-কথা বলে বোঝানো অসম্ভব। শুধু শিকার জীবনের স্মৃতির থলিতে তা পড়ে আছে। অতীতকে কাছে পাবার জন্য এখনো সেই রোদ সেই শরীর সেই দৃশ্যকে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে পারি।

ঠিক এ-রকম ঘটনা আরো একবার ঘটেছে।

সেবার বরাকর নদীতে চকা আর গ্রে ল্যাগ গুজ (বুনো রাজহাঁস) মারতে গিয়েছিলাম। জান কবুল করে দু'দিনের চেষ্টাতেও একটা পাখি মারা পড়ল না। ইংরিজিতে একটা প্রবাদ আছে চেজিং ওয়াইল্ড গুজ, লোকে কথায় তার ব্যবহার করে। আর আমরা কার্যত প্রবাদটিকে প্রমাণিত সত্য বলে মেনে নিলাম। সত্যিই আমাদের ভাগ্যে চেজিং দি ওয়াইল্ড গুজই সার হল।

পর পর দু'দিনের অকৃতকার্যতায় মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম; তৃতীয় দিন ঠিক করলাম, অন্ধকার থাকতে থাকতে সকলে গিয়ে এক এক ঘাঁটি আগলে বসে পড়ব। রাত ফরসা হয়ে গেলেই নির্বিবাদে হাঁস মারা যাবে।

কথা মতো সেই ডিসেম্বরের কড়া শীতে উন্মুক্ত বাতাসে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত উঁচু ঢিপির আড়ালে এক এক জায়গায় যথাসম্ভব শরীর গোপন রেখে সকলে বসে পড়লাম।

ক্রমে উষার অরুণাভা পূর্ব দিগন্তের সিঁথিতে সিঁদূর ছিটিয়ে অন্ধকার থেকে জগৎকে মুক্ত করল। নদীর বুক থেকে রাত্রি মুছে গেল। মাথার ওপর দিয়ে দু'চারটে কাক আর ফিঙ্গে পাখির দল নাচতে নাচতে নতুন দিনকে আহ্বান জানালো। সেই সঙ্গে ঘুমন্ত প্রাণীর প্রাণে জাগরণের বানী জোগালো। আকাশের লাল রঙ গাঢ় হল দেখতে দেখতে। সূর্যদেব তমসাবৃত পশ্চাৎপট থেকে সামনে এসে সহাস্য মুখে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরের স্বর্ণ কান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দিক-বিদিক।

তখন সবে সূর্যের সেই প্রথম আলোর রেশ এসে পড়েছিল নদীর এপারের উঁচু টিপিগুলোর মাথায়, গাছের চুড়োয়। স্বর্ণালী আলোয় ঝিকিমিকি গাছের মাথায় নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়া মানুষের মতো তাকিয়েছিলাম। যদিও বন্দুক হাতে শিকারীর পোশাকের সঙ্গে এই ভাবালুতা নিজের কাছেই বেখাপ্পা লাগছিল, তবুও এমন নদীর তীর শীতের কুয়াশামাখা ভোর গাছের মাথায় রঙের মাখামাখি নির্জন শূন্যতার একাকীত্ব—সমস্ত পারিপার্শ্বিকের মুগ্ধ করা ভিড় থেকে মনকে একাগ্র আয়ত্বে আনতে পারছিলাম না। বিমোহিত হয়ে বিস্মিতভাবে চেতনার নয়ন মেলে ভুলেছিলাম নির্দিষ্ট কর্ম থেকে।

এমন সময় সহসা সামান্য দূরে শেয়ালের ডাকের মতো আওয়াজ হল। আওয়াজটা কানে যেতেই দেহকে যথাসম্ভব গোপন করে ধীরে ধীরে শব্দ লক্ষ্য করে মাথা তুললাম। ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে চোখ পড়তেই দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। দেখলাম, একটা টিবির ওপর সদ্য দৃশ্যমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রমাণ সাইজের একটা নেকড়ে বাঘ মাঝে মাঝে তার মুঁখটা সামান্য আকাশের দিকে উঁচু করে ডাকছে। সেও যেন এই বর্ণালী শোভাকে আপন অন্তরে অনুভব করে প্রথম আলোকে স্বাগত জানাচ্ছে। এ রকম ডাককে ইংরিজিতে yelp করা বলা হয়।

তার শরীরেও সোনা আলো এসে লেগেছে। একটা উঁচু টিবির ওপর নিশ্চিন্ত একটি পশুর প্রত্যুষের আমেজ, সঙ্গে এখানকার এই অনবদ্য দৃশ্যের সোনালী সবুজ ঘননীল রঙের অপূর্ব ছোপ, দেখতে দেখতে মনে হল কোনো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর হাতে তৈরী ল্যাণ্ডস্কেপ দেখছি—আমি নিজে সেই ছবির গভীরে উপনীত হয়ে

হারিয়ে গেছি। অবশ্য সত্যিই অপূর্ব এই ছবির শিল্পী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া, অন্যের ক্ষমতার বাইরে এই ছবি রচনা। স্বর্গের তিল তিল বর্ণকে ইচ্ছে মতো তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে যেখানে যেমনটি দরকার তেমনি ভাবে সাজিয়ে কি গভার পরিপূর্ণতার সৃষ্টি করেছেন তিনি। অদৃষ্ট এমন শোভা না দেখতে পারলে বলে তা বোঝানো আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্যাতীত। তাছাড়া আমি শিকারী—আমার কাছে উপভোগ্য করে তোলবার মতো, রঙ মিশিয়ে এঁকে দেখানোর মতো শক্তি অনায়াত্ব।

শুধু সেই দৃশ্যের সামনে মূক হয়ে নিথর নিষ্কম্প কিছু সময় তাকিয়ে রইলাম। বোধ হয় পাঁচ কি ছ'মিনিট—মনে হল যেন অনাদি কালের স্বাদ অনুভব করছি চোখে মনে। এই সময়টুকুর মধ্যে মাথার ওপর দিয়ে হয়তো কত চখা আর চখী কত বনহংসী তাদের ডানায় আনন্দের গান বেঁধে নিয়ে গেল—আমার একবারও সে কথা মনে পড়ল না। অথবা একজন শিকারী হিসাবে ফাঁকায় এমন আচমকা সুযোগ পেয়ে একবারও মনে হল না নেকড়েটাকে মেরে ফেলি। শুধু অভিভূত নিজেকে এই দৃশ্যের হাতে সমর্পণই যেন আমার একমাত্র কর্তব্য।

নেকড়েটা ঢিবির ওপর থেকে নেমে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার চমক ভাঙল। তখনো লক্ষ্য করছি—পরবর্তী ঢিবির পর উঠে সে আর একবার সূর্যকে দেখল; তারপর ধীরে ধীরে তীরবর্তী জঙ্গলের সবুজের মধ্যে অদৃশ্য হল।

নেকড়ে মিলিয়ে যেতেই অনুভূতি থেকে স্বর্গ-স্বাদ মুছে গেল। আমার শিকারীরূপ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে চকা আর গ্রে ল্যাগে মন দিলাম। শিকার খুঁজলাম যথাসাধ্য। হা হতোস্মি! ভাগ্য বোধ হয় এ-যাত্রা মন্দই ছিল, সেদিনও কোনো

পাখিকে গুলিবিদ্ধ করতে পারলাম না। আপশোষের বিষয় যাত্রাটা চেজিং ওয়াইল্ড গুজ প্রবাদ বাক্যটিকে সত্য ঘটিয়ে দিয়ে সমাপ্ত হল। হতাশ মন নিয়ে ক্লান্ত পায়ে বাংলোয় ফিরে এলাম।

শিকারের নেশার মধ্যে গোপনে একটা হিংস্র মনোভাব বাসা বাঁধে, এ-কথা মনে করলে শিকারীদের প্রতি শুধু অবিচার করা হবে তাই নয়, তাদের মনকে বোঝার ব্যাপারেও একটা মস্ত বড় ভুল থেকে যাবে।

....

অরণ্যের আকর্ষণ

শিকার কাহিনী।

....

শিকারীদের চরিত্র বা তাদের অরণ্যের প্রতি ঝোঁককে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একটা অ্যাডভেঞ্চারের চিরন্তন নেশা, রক্তের মধ্যে

অদ্ভুত উন্মাদনা—যার প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা, মৃত্যুকে ছায়ার মতো সঙ্গী করে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে বিজয়ীর বা শক্তিমানের বেঁচে থাকার আনন্দ তার প্রতি এরা আকৃষ্ট। দ্বিতীয়ত অরণ্যের ঘেরাটোপে প্রকৃতির নিজস্ব একটা ভাষা আছে—তাই দিয়ে অহরহ সে আমাদের ডাকে, শহরের যান্ত্রিকতায় কিছু মানুষ তা ভুলে যায়, কিন্তু শিকারী মন ভোলে না, বার বার অরণ্যের ডাকে সাড়া দেয়, প্রকৃতির বুকে বিচরণেই তাদের সুখ—সেখানে তারা যেন অন্যতর স্বাদ, জীবনে অন্য ধরনের মুক্তি পায়। সামাজিক কারণে শহরেই তাদের থাকতে হয়, মাঝে মাঝে শিকারের নাম করে ছুটে যায় প্রকৃতির লাবণ্যের আড়ালে। সভ্যতার মায়াপাশে দম বন্ধ হয়ে আটকা থাকতে থাকতে বাঁধাধরা জীবনের বাইরে পা দিয়ে এই মানুষরা হাঁফ ছাড়ে এই স্বাধীন মুক্ত জীবনে তাদের শহরবাসের একঘেয়েমির রূপান্তর ঘটে। অরণ্যচারী অন্য পশুদের মতো সেও স্বইচ্ছায় অবাধে যেখানে যতক্ষণ খুশি বিচরণ করতে পারে। শ্যামল গভীর অরণ্য তার অন্তরের নিবিড় দুপুর, শাল মহুয়া আমলকি প্রভৃতি গাছের ভিড় শূন্য রুক্ষ প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের অনড় ঢেউ—নীল শোভা এ-সবই স্বাভাবিক ভাবে মনকে উদার করে। শিকারের নেশার সঙ্গে এ-সবের আকর্ষণ বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকে।

দিনের আলোয় জঙ্গলের রূপ সত্যই সুন্দর—ধ্যান গম্ভীর মহীরূহের সঙ্গে লতাগুল্মের আত্মীয়তা—বিভিন্ন বর্ণের মুক্ত পাখির কাকলিতে মুখর সারা অঞ্চল। আবার কুটিল রাত্রে শ্বাপদের নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, নিস্তব্ধতার প্রাকৃতিক শব্দে কেমন গা ছম ছম করা ভয়ে দমবন্ধ হয়ে আসে। উলঙ্গ রাত্রের নিচে অন্য আরেক রূপের পশরা নিয়ে জঙ্গল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন প্রতিটি

রোমকূপে স্নায়বিক রোমাঞ্চের অনাস্বাদিত ঢেউ লাগে। শরীর ভরে যায় শিহরণের স্বাদে।

গভীর বনের অভ্যন্তরে যে মানুষ বাস করে—তাদের জীবনের প্রতি পদে এই উন্মাদনা। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা প্রবাদকে সপ্রমাণিত করে তাদের বাঁচতে হয়। পশুরা যেমন তাদের মধ্যে এক অলক্ষ্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেঁচে থাকে, সেখানে পড়ে মানুষও অহরহ এই প্রতিযোগিতার সংগ্রামে মেতে ওঠে। একে অন্যের নির্দিষ্ট সীমানায় হাত বাড়ালেই লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। জীবন পণ যুদ্ধ। আবহমান কাল থেকে এই চলে আসছে। হারজিত হয় দু'পক্ষেরই।

অরণ্য নিকটবর্তী বস্তীর আশে পাশে গৃহপালিত পশুপাখি ধরতে এসে জানোয়াররা হামেশা প্রাণ দেয়—তেমনি, মানুষ যখন অরণ্য অভ্যন্তরে কাঠ, মধু আহরণে যায় তখন তাকেও এই প্রাণপাতের ঝুঁকি নিতে হয়। বিপদ পদে পদে। মৃত্যু এখানে উভয় পক্ষের হাতের কাছেই ঘোরাঘুরি করে। যে যখন তাকে আলিঙ্গনে আহ্বান করে সেই তাকে সহজে পেয়ে যায়।

এই প্রতিযোগিতায়, অনন্তর যুদ্ধে বেঁচে থাকবার জন্য প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম শুনে দূরে শহরের কৃত্রিম আরামের নিভৃতে বসে আমরা ভাবি কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! কি মর্মান্তিক মৃত্যু বা অদ্ভুত সাহস প্রদর্শন, কিন্তু অরণ্য নিবাসী পশু-মানুষ উভয়ের কাছেই এ-সব ঘটনা তুচ্ছ নিত্যনৈমিত্তিক পর্যায়ভুক্ত ঘটনামাত্র—কোনো সাহস বা সুযোগের ব্যাপার নয়, এখানে বাঁচতে হলে এ ভাবেই বাঁচতে হয়। জন্ম থেকে আমৃত্যু এখানকার মানুষ চাঁদের আলো, সূর্যের ঝলসানো রোদ সবুজ বৃক্ষের

মনোরম শোভা দেখে—তারপর পশুদের পরাক্রম, রাত্রির কুটিল অন্ধকার, বন্য-হিংস্রতার নিশ্বাস গায়ে মেখে পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নেয়।

হিংস্রতা, দৈনন্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই শুধু এখানের অধিবাসীদের একমাত্র পরিচয় নয়, ভিন্নতর ক্ষেত্রে মায়া মমতা সরলতার স্পর্শ দিয়ে পরকে আপন করবার অদ্ভুত ক্ষমতাও অসাধারণ।

পালামৌ অঞ্চলের কথা আমি জানি। ছোটনাগপুরের জঙ্গল বহু ঘুরেছি। সেখানে প্রতি ক্ষেত্রে যে অপূর্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তা আমার স্মৃতিতে আজীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সেখানে তখনো এত জনসমাগম ছিল না। এক পাহাড়ের মাথায় ছবির মতো এক ডাক-বাংলোয় একবার ছিলাম।

কি নির্জন শান্ত সেই স্থান—কি নিবিড় সুখানুভূতি সেখানের বাতাসে।

রাত্রির প্রদীপ্ত পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার ঝাড়ুদার খানসামারা ঘরে ঢুকে বসে থাকত প্রাণের মায়ায়। জিজ্ঞাসা করেছি। কি ব্যাপার ? উত্তরে বলেছে, এখন তো জানোয়ারদের রাজত্ব। সত্যিই তাই। গভীর অন্ধকারে বাইরে তখন অরণ্যচারী জন্তুদের রাজত্ব। সে সময়ে অন্যের অনধিকার প্রবেশ তারা মুখ বুজে সহ্য করবে না।

লোক মুখে শুনেছিলাম এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনবদ্য। গিয়ে দেখলাম, যা শুনেছি তার এক বর্ণও অত্যুক্তি নয়।

ডাকবাংলো থেকে অদূরে কোয়েল নদীর ওপারে নিরালা সূর্যোদয় প্রতিদিন দেখতাম। নদীর স্বচ্ছ জলে দিনান্তে গোপন সূর্যের বর্ণচ্ছটার আলপনা এখনো হৃদয়ের নিচে অদৃশ্য ছবি এঁকে স্মৃতিতে বেঁচে আছে।

অথচ যেখানকার সকালের সূচনায় এমন একান্ত উদাস রঙের মাখামাখি সেখানকার রাত্রের রূপ কি ভয়ঙ্কর। মৃত্যু যেন ওঁৎ পেতে বসে আছে প্রতিটি বৃক্ষের অন্ধকারের নিচে। জানোয়ার দেখার জন্য মোটরে করে ঘুরেছি ঠাস বুনোন লতাপাতা আর জঙ্গলের মধ্যে। কি প্রগাঢ় অন্ধকার। গাড়ির হেডলাইটের আলোর পেছনে এক রহস্যময় বিভীষিকা যেন লুকিয়ে আছে। আলো নেবালেই মনে হচ্ছিল এতক্ষণের অপেক্ষামান অন্ধকার যেন গাছগাছালি নিয়ে হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে একটানা ঝিঁঝির ডাক, মাঝে মাঝে এক একটা পেঁচা শূন্যতাকে চিৎকারে ভরিয়ে তুলছে যেন হৃদপিণ্ডের চলার শব্দ ছাড়া জীবনের অন্য সব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে।

আলো জ্বেলে কিছু দূর অগ্রসর হতেই পাশের জঙ্গল থেকে হঠাৎ একটি হরিণ মুখ বাড়াল। তার নীল কাচের গুলির মতো চোখে হেডলাইটের আলো পড়ে আমাদের চোখে সুষমা আঁকল। গাড়ি থামালাম। চকিতে ক্ষিপ্র পায়ে একটি হরিণশিশু লাফ দিয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে পড়েই বিমূঢ় হয়ে স্থির চোখে অপলকে হেডলাইটের আলো দেখতে লাগল। তার মা তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এল ত্রস্তে, ভীত বিক্ষিপ্ত তার পদক্ষেপ, যেন মৃত্যুকে বরণ করতে এসেছে। রাস্তায় উঠে এসে তার শাবকের পাশে বুক চিতিয়ে নির্ভীক এমন ভাবে দাঁড়ালো যে ভাবখানা এই—শাবকের জীবনের পরিবর্তে আমার জীবন দিতে রাজী আছি।

দূরত্ব মাত্র পনের বিশ গজ। ব্যবধান সামান্য। যে জন্য উজ্জ্বল আলোর আভায় ওর শরীরের সমস্ত লাবণ্য ধরা পড়ছে। সুডোল মসৃণ কান্তি চকচক করছে। একবার সে মাথা নিচু করে আপন শাবকের

মুখ স্পর্শ করল। সেই স্পর্শের ভেতর কি পরম মাতৃত্ব স্নেহ বাৎসল্য ফুটে উঠল।

আলোটা একবার নিবিয়ে আবার জ্বালা হল।

আশ্চর্য! হরিণটি এর মধ্যেই চোখের পলক ফেলতে বনের মধ্যে পলাতক। হয়তো তার পেছন পেছন শাবকটি কম্পিত পায়ে অরণ্যের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে।

সঙ্গের লোকটি আমাকে বলেছিল, 'আজ এই হরিণটির মৃত্যু নির্ঘাৎ, কারণ ও দলছাড়া হয়ে পড়েছে।'

কথাটা শুনে অকারণে মনটা গভীর শোকে ভরে গেল। বড় খারাপ লাগল। অথচ প্রকৃতির এই বিধান জীবন-মরণ সংগ্রামের কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে দুর্দান্ত শার্দূল এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ওর ঘাড়ে। কিছুক্ষণ হয়তো যুঝবে প্রাণপণ। তারপর সব শেষ। শাবকটি হয়তো বিস্ময়ে সজল চক্ষে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে। তারপর আপন ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে পলাতক হয়ে নিরাপত্তা খুঁজবে।

অরণ্যের নিভৃতের এই হিংসা আপাত চোখে যাই দেখাক তবু এই নিয়ম। এবং বাঁচবার জন্য এই নিয়মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে অরণ্য রমণীয়। বন আর নাম না জানা বনফুলের গন্ধে চারদিক ভরে আছে। পাখিদের বিচিত্র কলরব। নদীর স্বচ্ছ কাকচক্ষু জলের কুলুকুলু স্বর। মৌমাছির গুঞ্জন, ঝিঁঝির ডাক সমস্ত মিলিয়ে অদ্ভুত জঙ্গলের সুর।

কি জানি এই প্রাকৃতিক ঘেরের মধ্যে এসে পড়লে বুঝি মানুষ পুরোপুরি নিজেকে চিনতে পারে। নিজেকে মাঠ ঘাট প্রান্তরে মিলিয়ে ধরে বুঝতে পারে। আপনি কবিতা হয়ে যায় হৃদয়, নতুন আস্বাদের

জন্য উতলা হয় মন। মানুষের আদি জীবনের প্রচ্ছদপট-বর্তমান সভ্যজগতের পরিত্যক্ত, এই অকৃত্রিম বনভূমি। কিন্তু তার মূল্য অনেক। যা কোনো সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। এখানে এই মগ্নতার মধ্যে নেমে না এলে প্রকৃতির এই অনাদি ক্রীড়া না দেখলে জীবনে দেখবার মতো বহু জিনিসই অদেখা থেকে যায়।

ছোটনাগপুরের অরণ্য আমায় ডাকে। হৃদয়ে অন্তস্থলে সেই ডাক আমি শুনতে পাই। সাড়া না দিয়ে পারি না। কর্মস্থলে সামান্য অবসর পেলেই ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসি এখানে, এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে। এই নির্জন বনস্থলীতে। শান্ত ·স্বচ্ছ নদীর পাশে।

যেখানে পৌঁছলেই অগাধ শান্তি। কেমন স্বাধীনতার স্বাদ। যার বুকে আমার জন্য ঘুরে বেড়াবার স্থান সীমাবদ্ধ নয়। অবাধ চোখের দৃষ্টিকে আড়াল করে দাঁড়ায় না সভ্যতার সুউচ্চ ইমারৎ। বনানী তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার বুকের আদিমতার গন্ধ আমাকে আচ্ছন্ন করে। বার বার ফিরে গিয়ে তোমার সবুজ শ্যামল বিকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি—স্মৃতিতে মগ্নতার আস্বাদ আমাকে সুখ দেয়। মাথা নিচু করে বারবার বলি, আগামী দিনে আমি আবার আসব, তোমার এই বিভা যেন তখনো চোখ ভরে দেখতে পাই—তখনো তুমি যেন তোমার অকৃত্রিম ঐশ্বর্যে আমার হৃদয় ভরিয়ে তোল। আমাকে শান্তি দিতে পার।